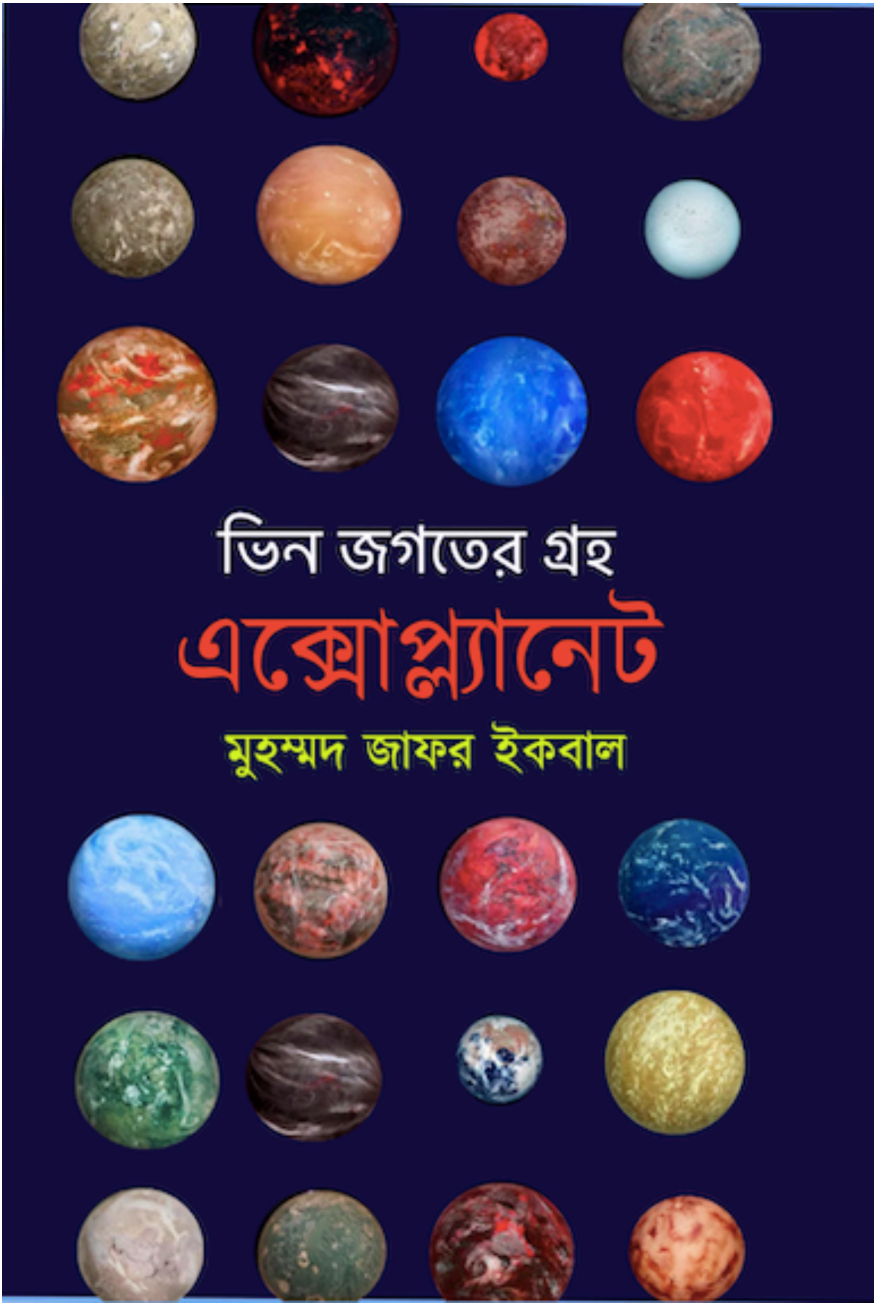
ভিন জগতের গ্রহ
এক্সোপ্ল্যানেট
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ভিনজগতের গ্রহ এক্সোপ্ল্যানেট

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ভিন জগতের গ্রহ এক্সোপ্ল্যানেট
মুহম্মদ জাফর ইকবাল
স্বত্ব: প্রফেসর ইয়াসমীন হক

প্রথ প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২৬
Publishers info

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

আলোকচিত্র: সংগৃহীত
https://science.nasa.gov/exoplanets/

Vin Jogoter Groho Exoplanet: Muhammed Zafar Iqbal

ভূমিকা

আমরা সবাই কখনো না কখনো আকাশের দিকে তাকিয়ে অসংখ্য নক্ষত্রকে মিটিমিটি করে জ্বলতে দেখেছি। আমরা এখন জানি শুধুমাত্র দৃশ্যমান বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ট্রিলিয়ন গ্যালাক্সির একটি হচ্ছে আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সি এবং সেই গ্যালাক্সির বিলিয়ন নক্ষত্রের একটি হচ্ছে সূর্য এবং সেই সূর্যের আটটি গ্রহের একটি হচ্ছে পৃথিবী, এবং সেই পৃথিবীর অতিক্ষুদ্র একটি প্রাণী হচ্ছি আমরা।

অথচ সেই অতিক্ষুদ্র প্রাণী হয়েই আমরা বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে শুরু করে অতিক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর রহস্য পর্যন্ত ভেদ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। কাজেই এটি খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে আমরা আকাশের মিটিমিটি করে জ্বলতে থাকা নক্ষত্রের রহস্য ভেদ করতে চাইব, সেই নক্ষত্রগুলোরও নিজস্ব গ্রহ আছে কিনা জানতে চাইব, সেই গ্রহে প্রাণের বিকাশ হয়েছে কিনা জানতে চাইব, সেই প্রাণ বুদ্ধিমান প্রাণীতে পরিণত হয়েছে কিনা জানতে চাইব!

ব্যাপারটি সহজ নয়, মাত্র 1995 সালে প্রথম সেই ভিন জগতের প্রথম গ্রহটি আবিষ্কৃত হয়েছে—যেগুলোকে আমরা বলি এক্সোপ্ল্যানেট। এখন পর্যন্ত কয়েক হাজার এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রতি বছর নয়, প্রতি সপ্তাহে সেই

সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে! বলা যেতে পারে বিজ্ঞানের জগতে একটি সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় শুরু হতে যাচ্ছে।

আমার তাই মনে হল আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য এক্সোপ্ল্যানেটের উপর একটি বই লিখে তাদেরকে সেই রহস্যময় জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাক! হয়তো তাদের কেউ কেউ বড় হয়ে বিজ্ঞানী হবে, এবং এই রহস্যময় জগতের গভীরে গিয়ে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারকে আরো একটু সমৃদ্ধ করবে!

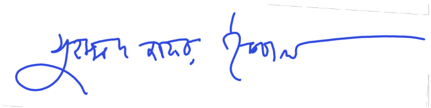

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
8 ডিসেম্বর 2025

1. এক্সোপ্ল্যানেট

বইটির নাম ‘ভিন জগতের গ্রহ: এক্সোপ্ল্যানেট’। মনে হয় প্রথমেই পরিষ্কার করে বলে দেওয়া দরকার ‘ভিন জগৎ’ বলতে আমি ঠিক কী বোঝাতে চাইছি। শুধু তাই নয়, বাংলায় লেখা একটা বইয়ের শিরোনাম এক্সোপ্ল্যানেট (exoplanet), এই ইংরেজি শব্দটা কেন রেখে দিয়েছি সেটাও মনে হয় একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। ভিন জগৎ বলতে আমি বুঝিয়েছি সৌরজগতের বাইরের গ্রহ। সৌরজগৎটির মাঝে আমরা থাকি (ছবি 1.1), এখানে সূর্য আমাদের নক্ষত্র, তাকে ঘিরে আটটি গ্রহ ঘুরপাক খাচ্ছে, সেই আটটি গ্রহের একটি হচ্ছে আমাদের পৃথিবী। কাজেই এটি হচ্ছে আমাদের জগৎ। রাতের আকাশে তাকালেই আমরা অসংখ্য নক্ষত্রকে ঝিকিমিকি করতে দেখি। এই নক্ষত্রদের ঘিরে যদি কোনো গ্রহ ঘুরপাক খায় তাহলে আমরা সেটাকে বলতে পারি ভিন জগতের গ্রহ। বিজ্ঞানীরা এই জগতের গ্রহদের জন্য একটি আলাদা নাম ঠিক করে রেখেছেন, সেটি হচ্ছে এক্সোপ্ল্যানেট । সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করলে এটি হতে পারে ‘বাইরের গ্রহ’ কিংবা ‘বহির্গ্রহ’। যেহেতু এক্সোপ্ল্যানেটের প্রতিশব্দ এখনো প্রচলিত হয়নি, তাই আমি এটির নাম এক্সোপ্ল্যানেটই রেখে দিয়েছি।

এখানে তোমাদের আরও একটি বিষয় মনে করিয়ে দেওয়া যায়। সৌরজগৎটি যেমন আমাদের জগৎ ঠিক সেরকম ছায়াপথটি (MilikyWay) হচ্ছে আমাদের

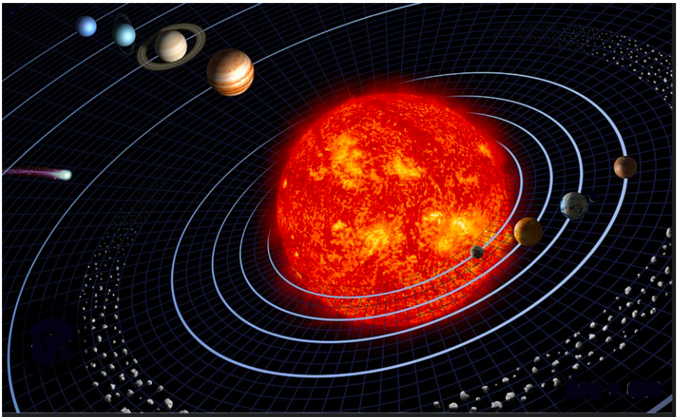

1.1 আমাদের সৌরজগৎ। সূর্যের কাছাকাছি চারটি পাথুরে গ্রহ, দূরে চারটি গ্যাসীয় গ্রহ।

গ্যালাক্সি (ছবি 1.2)। এই গ্যালাক্সিতে প্রায় দুইশো বিলিয়ন নক্ষত্র, সূর্য তার মাঝে একটি। এক বিলিয়ন মানে হচ্ছে একশ কোটি (যদি তোমরা মিলিয়ন বিলিয়ন হিসেবে গোনার থেকে লক্ষ কোটিতে গুনে বেশি সহজ বোধ করো!)। আমরা যখন রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে হাজার হাজার নক্ষত্র দেখতে পাই তখন আমরা আমাদের গ্যালাক্সির কাছাকাছি নক্ষত্রগুলো দেখতে পাই। তবে 'কাছাকাছি' শব্দটি শুনে কেউ যেন মনে না করে নক্ষত্রগুলো আসলেই আমাদের কাছাকাছি। আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রটি চার আলোকবর্ষ দূরে, অর্থাৎ সেই নক্ষত্রটি থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছাতে চার বছর লেগে যায় (আলোর বেগ সেকেন্ডে তিনশো হাজার কিলোমিটার)। সূর্য থেকে আলো আমাদের কাছে আসতে সময় নেয় আট মিনিট।

আমাদের গ্যালাক্সিটি একটি থালার মতো, তবে কিনারার তুলনায় মাঝখানের অংশটি প্রায় দশ গুণ ফুলে আছে। থালা হিসেবে কল্পনা করলে এই থালার ব্যাস প্রায় এক হাজার আলোকবর্ষ, অর্থাৎ মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির এক মাথা

থেকে অন্য মাথায় আলো এসে পৌঁছাতে সময় লাগে প্রায় একশো হাজার বছর! আমাদের সূর্য এই গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে কিনারার মাঝামাঝি জায়গায় আছে (ছবি 1.3) যেহেতু গ্যালাক্সিটি থালার মতো এবং আমরা থালার কেন্দ্র এবং কিনারা মাঝামাঝি জায়গায়, তাই কেন্দ্রের দিকে কিংবা বাইরের দিকে তাকালে অসংখ্য নক্ষত্রকে দেখতে পাই। অন্ধকার রাতে আকাশের এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত সাদা মেঘের মতো যে নক্ষত্রের সারি দেখা যায় সেটি হচ্ছে আমাদের গ্যালাক্সির মূল নক্ষত্র মণ্ডলী।

1.2 ছায়াপথ বা Milky Way হচ্ছে আমাদের গ্যালাক্সি।

সূর্য আমাদের গ্যালাক্সির একটি নক্ষত্র এবং সূর্যকে ঘিরে একটি-দুটি নয় আটটি গ্রহ ঘুরছে। যেহেতু আমাদের গ্যালাক্সিতে এরকম দুই বিলিয়ন নক্ষত্র রয়েছে কাজেই সেইসব নক্ষত্রের অনেকগুলোতেই একই রকম গ্রহ থাকা মোটেও বিচিত্র কিছু নয়। পৃথিবী থেকে সেগুলো দেখা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার কারণ গ্রহের নিজস্ব কোনো আলো নেই, শুধু তাই নয় যে নক্ষত্র ঘিরে গ্রহগুলো ঘুরবে সেই নক্ষত্রের তীব্র আলোর তুলনায় অন্য সবকিছু নিষ্প্রভ হয়ে যায়। নক্ষত্রগুলো রয়েছে পৃথিবী থেকে কয়েক আলোকবর্ষ থেকে শুরু করে কয়েক হাজার আলোকবর্ষ দূরে, তাই অনেকেই ধরেই নিয়েছিল যে নক্ষত্র ঘিরে ঘুরতে

থাকা সেই গ্রহগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা বুঝি কোনো দিনই কিছু জানতে পারব না।

কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি আমরা শুধু যে এরকম গ্রহের অস্তিত্বের কথা জানতে পেরেছি তা নয়, গ্রহগুলোর পৃথিবী থেকে দূরত্ব, তাদের আকার, ভর, তাপমাত্রা এমনকি সেটি কী দিয়ে তৈরি সেটি পর্যন্ত জানতে শুরু করেছি। এই গ্রহগুলোকেই বলা হয় এক্সোপ্ল্যানেট। 1995 সালে প্রথম এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে প্রতি বছর নতুন নতুন এক্সোপ্ল্যানেটের কথা আমরা জানতে পারছি। এখন পর্যন্ত (2025) প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং বলা যায় প্রতি সপ্তাহেই এই সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি জ্যোতির্বিজ্ঞান জগতে সম্পূর্ণ নতুন একটি অধ্যায় শুরু হয়েছে। যে অধ্যায়টি বর্তমানের সবচেয়ে চমকপ্রদ একটি অধ্যায়।

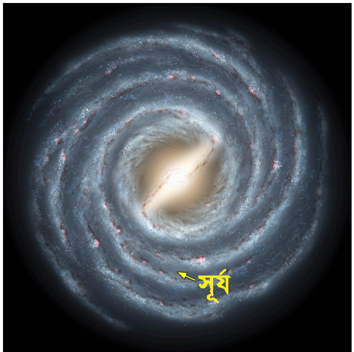

1.3 ছায়াপথ গ্যালাক্সিতে সূর্যের অবস্থান।

তোমাদের মনে রাখতে হবে আমরা কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের গ্যালাক্সির এক্সোপ্ল্যানেটের কথা বলছি। দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আকার প্রায় একশো বিলিয়ন আলোকবর্ষ। অনুমান করা যায় এর মাঝে মোট গ্যালাক্সির সংখ্যা প্রায় এক ট্রিলিয়ন। কাজেই সেই গ্যালাক্সিগুলোতেও নিশ্চিতভাবে অসংখ্য নক্ষত্র রয়েছে। শুধু তাই নয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একশো বিলিয়ন আলোকবর্ষের পর শেষ হয়ে গেছে সেটি কিন্তু সত্যি নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেহেতু প্রসারিত হচ্ছে তাই

এর বাইরে থেকে আলো রওনা দিলে সেটি কখনো আমাদের কাছে পৌঁছাতে পারবে না এবং আমরা তার কথা জানতে পারব না, কিন্তু তাই বলে সেটি নেই, তা কিন্তু সত্যি নয়, প্রকৃত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কত বিশাল আমরা জানি না। কে জানে, সেটি হয়তো অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত।

2. সৌরজগৎ ও সূর্য

ভিন জগতের গ্রহের কথা জানার আগে মনে হয় আমাদের সৌরজগতের নিজেদের গ্রহগুলোর কথা একটু জানা দরকার। আমাদের সৌরজগতে যেহেতু একটি নক্ষত্র আছে, তাই আলোচনাটি পূর্ণাঙ্গ করার জন্য প্রথমে আমরা নক্ষত্র বলতে কী বুঝায় সেটিও একটুখানি বুঝে নেবো।

নক্ষত্র

নক্ষত্র হচ্ছে একটি অতিকায় গ্যাসপিণ্ড। গ্যাসটি মূলত হাইড্রোজেন গ্যাস। নক্ষত্রের আকার যেহেতু বিশাল, তার ভেতরকার গ্যাসের ভরও বিশাল এবং এই বিশাল ভরের কারণে পুরো গ্যাসপিণ্ডটি মহাকর্ষ বলের আকর্ষণে সংকুচিত হতে থাকে। যতই সংকুচিত হয় গ্যাসপিণ্ডটি ততই উত্তপ্ত হতে থাকে। উত্তপ্ত হতে হতে সেটি একসময় এত উত্তপ্ত হয়ে যায় যে হাইড্রোজেন গ্যাসের নিউক্লিয়াস (যেটি আসলে একটি প্রোটন ছাড়া কিছুই নয়), প্রচণ্ড বেগে একটি আরেকটিকে আঘাত করতে থাকে এবং নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এই নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার নাম ফিউশন (ছবি 2.1) এবং তখন বিপুল পরিমাণ শক্তি বের হয়ে আসে। বিজ্ঞানীরা এখনো ল্যাবরেটরিতে নিয়ন্ত্রিতভাবে ফিউশন করে শক্তি পেতে শুরু করেননি, তবে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ফিউশন করে হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করেছেন—যেটি এখন পর্যন্ত মানুষের তৈরি করা সবচাইতে শক্তিশালী বিধ্বংসী বোমা।

একটি নক্ষত্রে যখন ফিউশন শুরু হয়, আমরা বলি, নক্ষত্রটি ‘জ্বলে’ উঠেছে, সেখান থেকে তাপ, আলো এবং রেডিয়েশন বের হতে থাকে। ভিতর থেকে উত্তপ্ত গ্যাসের চাপ মহাকর্ষ বলের কারণে সংকুচিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি থামিয়ে দেয়। নক্ষত্রটি একটি নির্দিষ্ট আকার নিয়ে স্থিতিশীলভাবে তাপ, আলো আর রেডিয়েশন বিকিরণ করতে থাকে। সূর্য ঠিক এরকম একটি নক্ষত্র।

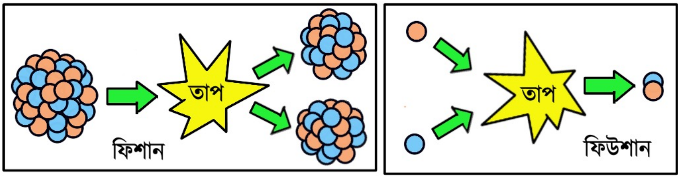

2.1 দুই ধরনের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া, ফিশান ও ফিউশান। ফিশান পদ্ধতিতে বড় নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে ছোট নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। ফিউসান পদ্ধতিতে ছোট নিউক্লিয়াস একত্র হয়ে বড় নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়।

শুরুতে কতখানি হাইড্রোজেন গ্যাস নিয়ে শুরু করেছিল তার উপর নির্ভর করে গ্যাসপিণ্ডটিতে কি ফিউশন বিক্রিয়া শুরু হয়ে সেটি জ্বলে উঠবে নাকি গ্যাসপিণ্ড হয়েই একটি ব্যর্থ নক্ষত্র হিসেবে থেকে যাবে। আবার যখন একবার আলো, তাপ এবং রেডিয়েশান বিকিরণ করে সেটি সত্যিকারের একটি নক্ষত্র হয়ে উঠে, তখন সেটি কতদিন বেঁচে থাকবে সেটিও নির্ভর করে শুরুতে এটি কতখানি হাইড্রোজেন গ্যাস নিয়ে শুরু করেছিল তার উপর। নক্ষত্র জীবন্ত প্রাণী নয় কিন্তু তার জন্য সত্যি সত্যিই জন্ম, মৃত্যু, আয়ু এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়! শুধু তাই নয়, তার মৃত্যুটিও স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ মৃত্যু হতে পারে কিংবা অস্বাভাবিক ‘ভায়োলেন্ট’ মৃত্যুও হতে পারে। নক্ষত্র যেহেতু হাইড্রোজেন গ্যাসকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে, তাই যখন তার সব জ্বালানি শেষ হয়ে যায়, সেটি মৃত্যুবরণ করে। স্বাভাবিকভাবেই তোমাদের মনে হতে পারে একটি নক্ষত্রের ভর যত বেশি অর্থাৎ নক্ষত্রটিতে যত বেশি জ্বালানি

থাকবে, সেটি ততদিন বেঁচে থাকবে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটি হয় ঠিক তার উল্টো। একটি নক্ষত্রের ভর যত বেশি সেটি তত তত বেশি তাপ এবং আলো সৃষ্টি করে তত দ্রুত তার জ্বালানি শেষ করে মৃত্যুবরণ করে (ছবি 2.2)।

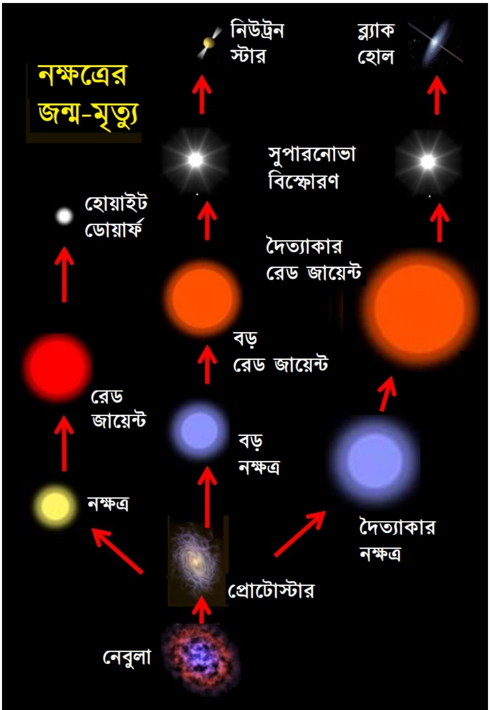

2.2 নক্ষত্রের জন্ম, জীবন এবং মৃত্যু।

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছে তাপ মাত্রার সাথে রঙয়ের একটা সম্পর্ক আছে। একটা লোহা গরম করলে একসময় সেটি গনগনে লাল হয়ে আলো দিতে থাকে। আরো বেশি গরম করলে সেটি ধীরে ধীরে নীলাভ সাদা রঙ নিতে থাকে। নক্ষত্রের বেলাতেও সেটি ঘটে। যে নক্ষত্রের ভর যত বেশি সেটি তত বেশি তাপমাত্রায় জ্বলতে থাকে এবং তার আলোর রঙও সেভাবে নির্ধারিত হয়। নক্ষত্রের ভর রঙ এবং ঔজ্জ্বল্যের উপর নির্ভর করে এই নক্ষত্রগুলোকে সাতভাগে ভাগ করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে

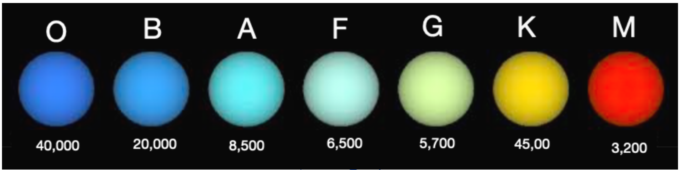

2.3 নক্ষত্রের রঙ, তাপমাত্রা এবং ভরের উপর নির্ভর করে সেগুলোকে সবচেয়ে বড় এবং উত্তপ্ত থেকে সবচেয়ে ছোট এবং শীতল হিসেবে O, B, A, F, G, K এবং M এই সাতটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। সূর্য G নক্ষত্র। নিচে নক্ষত্রের তাপমাত্রাও দেখানো হয়েছে।

O, B, A, F, G, K এবং M (ছবি 2.3) এই তালিকায় O সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রার এবং M সবচেয়ে কম তাপমাত্রার নক্ষত্র। আমাদের সূর্য হচ্ছে G ক্যাটাগরির। তালিকায় যেহেতু নক্ষত্রের ভাগগুলো A, B, C, D… এরকম সহজভাবে সাজানো নেই তাই সেগুলো মনে রাখার জন্য সবাই একটি ইংরেজি বাক্য ব্যবহার করে। এইবইয়ের জন্য বাংলায় ইংরেজিতে লিখে সাতটি শব্দের একটি বাক্য তৈরি করা হয়েছে, যে বাক্যে শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর এই 7 টি ক্যাটাগরি! বাক্যটি হচ্ছে Ore Baba Ajker Fol Gulo Koto

টেবিল 2.1

ক্যাটাগরি	রঙ	ভর	ব্যাসার্ধ	তাপমাত্রা C
O	নীল	50	10	40,000
B	হালকা নীল	10	5	20,000
A	সাদা	2	1.7	8,500
F	হাল্কা হলুদ	1.5	1.3	6,500
G	হলুদ	1.0	1.0	5,700
K	কমলা	0.2	0.8	4,500
M	লাল	0.01	0.3	3,200

Misti! (ওরে বাবা, আজকের ফল গুলো কত মিষ্টি!)! তোমরা তোমাদের মত এরকম বাক্য তৈরি করে নিতে পার! টেবিল 2.1 টিতে সূর্যের সাপেক্ষে বিভিন্ন ধরণের নক্ষত্রের ভর এবং ব্যাসার্ধ দেখানো হল। একই সাথে তাপমাত্রা এবং রঙটিও দেখানো হয়েছে। আমরা যখন এক্সোপ্ল্যানেট নিয়ে আলোচনা শুরু করব তখন আমরা এই তালিকাটি বেশ কয়েকবার ব্যবহার করব।

জ্বালানি শেষ করে যখন নক্ষত্র জীবনের পরিসমাপ্তি হয় তখন নক্ষত্রের ভেতরে আর তাপ সৃষ্টি হয় না। এই তাপ দিয়ে উত্তপ্ত হওয়া গ্যাস নক্ষত্রের বিশাল ভরকে মহাকর্ষ বলে সংকুচিত হওয়া ঠেকিয়ে রেখেছিল কিন্তু যখন তাপ সৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে তখন নক্ষত্রের সংকোচনকে আর থামানোর কিছু নেই। যদি নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের 1.4 গুণ থেকে কম হয় তাহলে একটি পর্যায়ে সেটি থেমে যায়, আমরা বলি শান্তিপূর্ণ মৃত্যু হয়েছে। পাঁচ বিলিয়ন বছর পর সূর্যের যেটি ঘটবে। কিন্তু ভর যদি সূর্যের ভর থেকে 1.4 গুণ থেকেও বেশি হয় তাহলে সংকোচনকে থামানোর কোনো উপায় থাকে না। খুব দ্রুত এটি সংকুচিত হয়, এক পর্যায়ে বাইরের অংশটি বিস্ফোরণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। নক্ষত্রের ভর যদি সূর্যের ভর থেকে আর অনেক বেশি হয় (10-40 গুণ) তাহলে ভিতরের অংশটি মহাকর্ষ বলের প্রচণ্ড আকর্ষণে একটি নিউট্রন স্টার কিংবা ব্ল্যাক হোলে পরিণত হয়। প্রকৃত প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট চমকপদ কিন্তু আমরা আপাতত আমাদের আলোচনা সৌরজগৎ আর তার গ্রহের মাঝে সীমাবদ্ধ রখি।

সূর্য (Sun)

আমাদের সৌরজগতের নক্ষত্র সূর্য এই গ্যালাক্সির খুবই সাধারণ, মাঝবয়সী একটি স্থিতিশীল নক্ষত্র। পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ হওয়ার জন্য এই

স্থিতিশীলতার অনেক বড় একটা ভূমিকা আছে। এটি G ধরণের নক্ষত্র, ব্যাসার্ধ 1.39 বিলিয়ন কিলোমিটার, পাশাপাশি রাখা হলে 109 টি পৃথিবী রাখা যাবে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি, সূর্যের ভর পুরো সৌরজগতের 99.86% শতাংশ! এর চারভাগের প্রায় তিন ভাগ হাইড্রোজেন। ফিউশন প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে পরিণত করে বাকী একভাগ হয়েছে হিলিয়াম। প্রতি সেকেন্ডে সূর্য 600 বিলিয়ন কেজি (600×10^9 kg) হাইড্রোজেনকে 596 বিলিয়ন কেজি (596×10^9kg) হিলিয়ামে পরিণত করে। দেখতেই পাচ্ছ চার বিলিয়ন কেজি ভরের হিসাব মিলছে না! এই চার বিলিয়ন কেজি ভর (4×10^9 kg) আইনস্টাইনের $E=mc^2$ নিয়মে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়! এই ফিউশন প্রক্রিয়াটি ঘটে সুর্যের কেন্দ্রে যেখানে তাপমাত্রা 15 মিলিওন ডিগ্রী! এই তাপ খুব ধীরে ধীরে (170,000 বছরে) একাধিক ধাপে সুর্যের পৃষ্ঠদেশে পৌঁছায় যেখানে তাপমাত্রা মাত্র 5500 ডিগ্রি C। সুর্যের একটি পাতলা উত্তপ্ত (তাপমাত্রা মিলিওন ডিগ্রী) বায়ুমণ্ডল

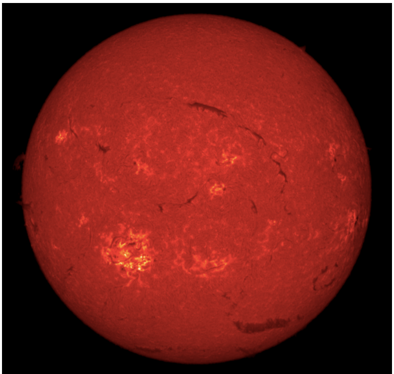

2.4 সূর্য। বিশেষ ফিল্টার ব্যাবহার করে ছবি তোলা হয়েছে বলে এটির রঙ লাল দেখা যাচ্ছে।

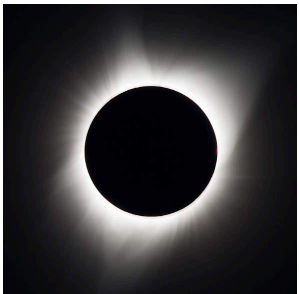

2.5 শুধুমাত্র সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের ‘বায়ুমণ্ডল’ করোনা দেখা যায়।

আছে যেটিকে বলা হয় করোনা। শুধুমাত্র সুর্যগ্রহণের সময় (ছবি 2.5) সেটি দেখা যায়।

সুর্য সৃষ্টি হয়েছে 4.5 বিলিয়ন বছর আগে এবং পাঁচ বিলিয়ন বছর পর সূর্যের জ্বালানী হাইড্রোজেন গ্যাস শেষ হয়ে যাবে। তাপ সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে বলে সুর্যের পুরো ভর মহাকর্ষ বলের আকর্ষণে সঙ্কুচিত হয়ে একসময়ে হিলিয়ামের ফিউশান শুরু হবে। এটি তাপ সৃষ্টি করে এটিকে অতিকায় অস্থিতিশীল একটি রেড জায়ান্ট নক্ষত্রে রূপান্তরিত করবে যেটি সম্ভবত ধীরে ধীরে পৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গ্রহগুলোকে ভস্মীভূত করে দেবে। এভাবে 2 বিলিয়ন বছর পরে বাইরের অংশটি নেবুলা হিসেবে ছড়িয়ে পড়বে এবং ভেতরের উত্তপ্ত অংশটি ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন বছর হোয়াইট ডোয়ার্ফ হিসেবে রয়ে যাবে।

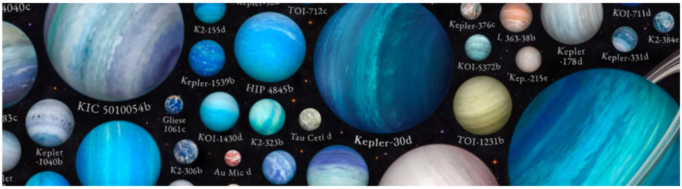

3: সৌরজগৎ ও গ্রহ

কিছুদিন আগেও আমরা বলে এসেছি সৌরজগতের গ্রহের সংখ্যা নয়টি। 2005 সালে বিজ্ঞানীরা যখন দেখলেন প্লুটো থেকেও বড় একটা গ্রহ সূর্যকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে তখন গ্রহের সংখ্যা আর না বাড়িয়ে, সব বিজ্ঞানীরা মিলে আলাপ আলোচনা করে 2006 সালে প্লুটোকে তার গ্রহের অবস্থান থেকে বাতিল করে দিলেন। সেটিকে বাতিল করার জন্য তারা গ্রহের জন্য নতুন একটি সংজ্ঞাও তৈরি করলেন। কাজেই আমাদের মনে হয় এখন গ্রহ বলতে কি বোঝায় সেটি সবার আগে বুঝে নেওয়া দরকার।

নতুন সংজ্ঞাটিতে গ্রহ হওয়ার জন্য তিনটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। সেগুলো এরকম:

(1) গ্রহ হতে হলে সেটিকে সূর্যকে ঘিরে ঘুরতে হবে। এজন্য বৃহস্পতি কিংবা শনির চাঁদ রয়েছে যেগুলো বুধগ্রহ থেকেও বড়, কিন্তু যেহেতু তারা সূর্যকে ঘিরে না ঘুরে বৃহস্পতি কিংবা শনিকে ঘিরে ঘুরছে তাই সেগুলো গ্রহ নয়।

(2) গ্রহ হতে হলে অবশ্যই তাকে গোলাকার হতে হবে। কোনো বস্তুর আকার যথেষ্ট বড় হলে তার আভ্যন্তরিন মহাকর্ষ বলের আকর্ষণের সেটি গোলাকার

হয়ে যায়। ফোবোস নামে মঙ্গলের একটি চাঁদ আছে যেটির আকার ছোট বলে সেটি গোল নয়, এবড়ো-থেবড়ো!

(3) গ্রহ হতে হলে অবশ্যই সেটিকে তার নিজের মহাকর্ষ বল ব্যবহার করে তার কক্ষপথকে পরিষ্কার রাখতে হবে! এই যুক্তিটি দেখিয়ে প্লুটোকে তার গ্রহের সম্মান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। একই কারণে এরিসও (Eris) গ্রহ হতে পারেনি।

টেবিল 3.1

গ্রহ	ব্যাস AU	ভর	সূর্য থেকে দূরত্ব AU	গ্রহ-বছর	অক্ষে ঘূর্ণন	অক্ষের কোণ	তাপমাত্রা
বুধ	0.38	0.055	0.39	0.24	59d	0.034	167
শুক্র	0.98	0.815	0.72	0.62	243d	177.4	464
পৃথিবী	1.00	1.00	1.00	1.00	24h	23.5	15
মঙ্গল	0.53	0.107	1.52	1.88	24h	25.2	-65
বৃহস্পতি	10.97	317.8	5.20	11.86	10h	3.1	-110
শনি	9.14	95.2	19.22	29.46	11h	26.7	-140
ইউরেনাস	3.98	3.98	19.22	84.10	17h	97.8	-195
নেপচুন	3.86	3.86	30.10	164.8	16h	28.3	-200

পৃথিবী

ব্যাস	12,742 km	ভর	5.97×10^{24} km	সূর্য থেকে দূরত্ব	149×10^{6} km	বছর	365.25d 346×10^{7}s

সূর্য

ব্যাস	1.39×10^{6} km	ভর	1.99 $\times 10^{30}$ kg	অক্ষে ঘূর্ণন সময়	25d কেন্দ্র 35d মেরু	কক্ষপথে ঘূর্ণনকাল	23×10^{7} year

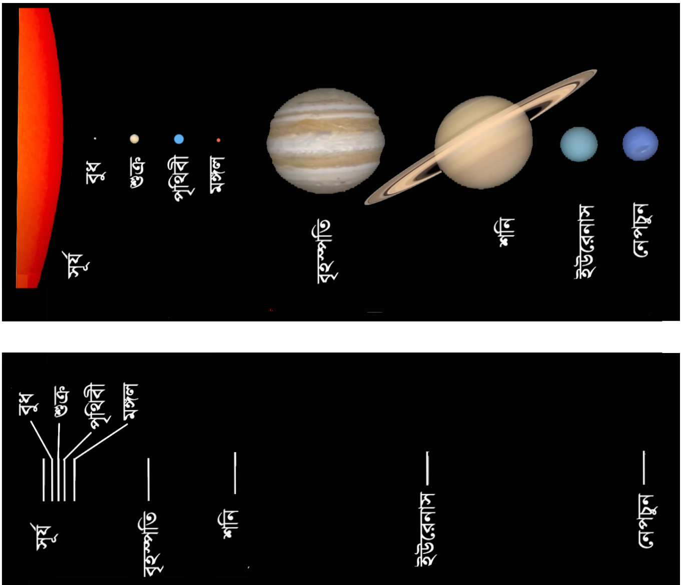

3.1 মোটামুটি সঠিকভাবে আঁকা গ্রহের তুলনামূলক আকার (উপরে) ও সুর্য থেকে দূরত্ব (নিচে)।

গ্রহ হওয়ার জন্য এই তিনটি নিয়ম তৈরি করার পর আমাদের সৌরজগতের গ্রহের সংখ্যা হয়েছে আটটি। সেগুলো হচ্ছে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস এবং নেপচুন। এদের মাঝে বুধ গ্রহ সূর্যের সবচেয়ে কাছে এবং নেপচুন সবচেয়ে দূরে। এই আটটি গ্রহের মাঝে প্রথম চারটি গ্রহ হচ্ছে আকারে ছোট পাথরের গ্রহ এবং পরের চারটি হচ্ছে আকারে বিশাল গ্যাসের গ্রহ। শুধু তাই নয় প্রথম চারটি সূর্যের কাছাকাছি এবং পরের গ্রহগুলো সূর্য থেকে দূরে এবং একটি থেকে আরেকটিও অনেক দূরে দূরে। গ্রহগুলোর আকার এবং তাদের মাঝে দূরত্ব এমন যে বইয়ের একটি পৃষ্ঠায়

সবগুলো গ্রহের আকার এবং দূরত্ব তুলনামূলকভাবে সঠিক রেখে আঁকা সম্ভব নয়, তাই 3.1 ছবিতে দুটি ভিন্ন ছবিতে গ্রহগুলোর তুলনামূলক আয়তন এবং সূর্য থেকে তুলনামূলক দূরত্ব দেখানো হল। ব্যাপারটি বোঝার জন্য 3.1 টেবিলে তোমাদের পৃথিবীর সাপেক্ষে গ্রহগুলোর আকার, ভর, গ্রহ বছর এবং সূর্য থেকে দূরত্ব দেখানো হলো। টেবিলটি পরিপূর্ণ করার জন্য অক্ষের কোণ, অক্ষে ঘূর্ণন কাল এবং পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রাও দেখানো হয়েছে।

এবারে আমরা সৌরজগতের আটটি গ্রহ সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করে নেই।

বুধ (Mercury)

বুধ গ্রহ সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি, সবচেয়ে ছোট আকারের (ব্যাসার্ধ আমাদের চাঁদের কাছাকাছি) এবং সবচেয়ে দ্রুত ধাবমান গ্রহ (ছবি 3.2)। পৃথিবী যতদিনে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে বুধ গ্রহ সেই সময়ে সূর্যকে চারবার প্রদক্ষিণ করে ফেলে। অর্থাৎ পৃথিবী-বছর যখন 365 দিন, পৃথিবীর হিসেবে বুধ গ্রহের বছর হয় 88 দিনে। কম ভরের ছোট গ্রহ বলে মহাকর্ষ বল দিয়ে বাতাসকে ধরে রাখতে পারে না তাই এর বায়ুমন্ডল নেই। সে কারণে উল্কা, গ্রহকণা বা ধূমকেতু সরাসরি এটিকে আঘাত করতে পারে তাই এর পৃষ্ঠদেশ চাঁদের মতোই ক্ষত বিক্ষত খানা খন্দে ভরা।

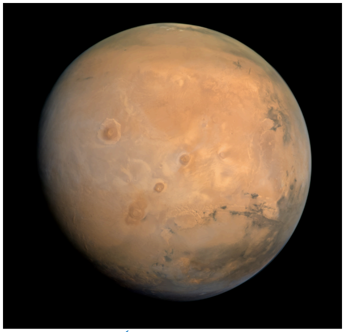

3.2 বুধ গ্রহ সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ।

বায়ুমণ্ডল না থাকায় বুধ গ্রহ তাপমাত্রাও ধরে রাখতে পারে না সূর্যের খুব কাছাকাছি থাকায় দিনে তাপমাত্রায় বেড়ে হয় 430 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রাত্রে কমে নেমে আসে -180 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে! দিন এবং রাতে তাপমাত্রার এতো পার্থক্য থাকার আরেকটি কারণ হচ্ছে বুধ গ্রহের তার অক্ষে (প্রায় খাড়া ভাবে) ঘূর্ণন হয় খুবই ধীরে, পৃথিবীর হিসেবে 59 দিন। সাধারণ হিসেবে মনে হতে পারে বুধ গ্রহে বুঝি প্রায় এক মাস দিন এবং এক মাস রাত! কিন্তু গ্রহটি যেহেতু নিজের অক্ষে এক জায়গায় স্থির থেকে ঘুরছে না, একই সাথে সুর্যকে ঘিরে ঘুরছে সে কারণে বুধ গ্রহের আকাশে সুর্য থাকে প্রায় এক বুধ-বছর এবং অন্ধকার রাতটিও স্থায়ী হয় আরেক বুধ-বছর! (পরিশিষ্ট 12.1)

শুক্র (Venus)

শুক্র গ্রহকে বলা হয় পৃথিবীর হিংসুটে বোন (Evil Sister)! এর আকার আকৃতি পৃথিবীর মত সেজন্য এটি বোন, কিন্তু প্রকৃতি মোটেই পৃথিবীর মতো কোমল নয়—ভয়ানক, সেজন্য হিংসুটে! এটি সূর্যের কাছাকাছি থাকা দ্বিতীয় গ্রহ, সে হিসেবে প্রথম গ্রহ বুধ থেকে এর তাপমাত্রা কম থাকা উচিত ছিল,

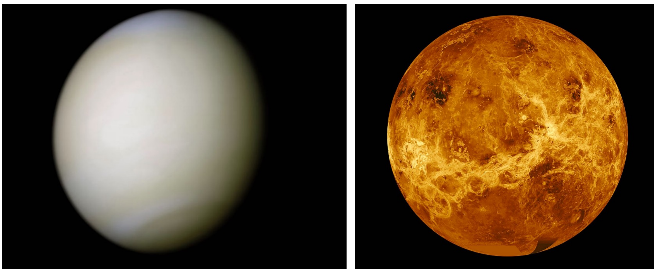

3.3 শুক্র গ্রহ, (বাম দিকে) মেঘে ঢাকা এবং (ডান দিকে) রাডার দিয়ে তোলা পৃষ্ঠদেশের ছবি।

কিন্তু এটি সৌরজগতের সবচেয়ে উত্তপ্ত গ্রহ! এর তাপমাত্রা 464 ডিগ্রী—এই অচিন্ত্যনীয় তাপমাত্রায় সিসা পর্যন্ত গলে যায়। তার কারণ এর একটি

বায়ুমণ্ডল আছে যেটি মূলত কার্বন ডাই অক্সাইড। আমরা জানি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যাওয়ার কারণে গ্রিন হাউস এফেক্টে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। শুক্রগ্রহেও একই ব্যাপার ঘটেছে অনেক বড় আকারে! সেটির কার্বন ডাই অক্সাইডের বায়ুমণ্ডল থেকে তাপকে ধরে রাখতে রাখতে তাপমাত্রা বাড়িয়ে তুলেছে। শুক্রগ্রহ সবসময় মেঘে ঢাকা এবং সেই মেঘে রয়েছে সালফিউরিক এসিড (ছবি 3.2)!

যদিও শুক্র গ্রহ আকারে পৃথিবীর কাছাকাছি (95%), সূর্য থেকে দূরত্ব পৃথিবীর প্রায় তিন চতুর্থাংশ এবং পাথুরে গঠনও পৃথিবীর মত, কিন্তু এর প্রকৃতি মোটেও পৃথিবীর মত নয়। মেঘের আড়ালে ঢেকে থাকা শুক্র গ্রহে আছে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি, সেখানে অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে, প্রচণ্ড ঝড় হচ্ছে! তাপমাত্রার কথা আগেই বলা হয়েছে, বাতাসের চাপও অনেক বেশি—পৃথিবী থেকে প্রায় 100 গুণ! বাতাসের ঘনত্ব প্রায় 50 গুণ!

তবে শুক্রগ্রহের সবচেয়ে বিচিত্র বিষয়টি হচ্ছে এটি সৌরজগতের একমাত্র গ্রহ যেটি তার অক্ষে উল্টোদিকে ঘুরে, অর্থাৎ সূর্য উঠে পশ্চিম দিকে এবং অস্ত যায় পুর্ব দিকে! (তবে এখানে পূর্ব আর পশ্চিমটি বলা হচ্ছে সূর্য, কিংবা কক্ষপথের সমতলের সাপেক্ষে।) এর কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা মনে করেন হয়তো অতীতে কোনো একটি রাক্ষুসে আকারের কিছুর সাথে ধাক্কা লেগে গ্রহটি পুরোপুরি উল্টে গেছে!

গ্রহটি যে শুধু উল্টোদিকে ঘুরছে তা নয়, নিজ অক্ষে ঘুরে আসতেও সময় লাগে অনেক বেশি, পৃথিবীর 243 দিন! যখন সূর্যকে ঘিরে পুরো কক্ষপথকে ঘুরে আসতে (শুক্র-বছর) তার এর থেকে কম সময় লাগে, মাত্র 225 দিন! কাজেই মনে হতে পারে শুক্রগ্রহে বুঝি এক সূর্যোদয় থেকে পরের সুর্যোদয়ের জন্য এক শুক্র-বছর থেকে বেশি সময় লেগে যাবে। কিন্তু মজার ব্যাপার

হচ্ছে শুক্র গ্রহের এক সূর্যোদয় থেকে আরেক সূর্যোদয় পর্যন্ত সময় প্রায় অর্ধেক শুক্র-বছর (117 দিন)। বুধ গ্রহে তার অক্ষের ঘূর্ণন আর কক্ষপথে ঘূর্ণন ছিল একই দিকে তাই সেখানে এক সুর্যোদয় থেকে পরের সূর্যোদয়ের সময় বেড়ে গিয়েছিল। শুক্র গ্রহে তার অক্ষের ঘূর্ণন আর কক্ষপথে ঘূর্ণন হচ্ছে বিপরীত দিকে, তাই সেখানে এক সূর্যোদয় থেকে পরের সূর্যোদয়ের সময় কমে গিয়েছে (পরিশিষ্ট 12.2)।

পৃথিবীর ঠিক আগের গ্রহ হওয়ার কারণে শুক্রগ্রহকে পৃথিবী থেকে খুব ভালো দেখা যায়। চাঁদ আর সূর্যের পর শুক্রগ্রহ সবচেয়ে উজ্জ্বল, সূর্য ওঠার আগে পূব আকাশে এবং ডোবার পড়ে পশ্চিম আকাশে শুক্র গ্রহকে স্পষ্ট দেখা যায়। চাঁদে যেমন অমাবশ্যা-পূর্ণিমা হয়, চাঁদের আলো বাড়ে কমে, শুক্রগ্রহেও সেটি ঘটে, ভালো করে লক্ষ্য করলে সেটিকেও বাড়তে কমতে দেখা যাবে।

পৃথিবী (Earth)

3.4 আমাদের প্রিয় আবাসভূমি পৃথিবী।

প্রথম চারটি পাথুরে এবং ধাতব গ্রহের মাঝে পৃথিবী সবচেয়ে বড়। এটি সূর্য থেকে 150 মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে, এই দূরত্বকে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট বা AU বলে। (আমরা এই বইয়ে বেশিরভাগ সময়ে AU দিয়ে দূরত্ব প্রকাশ করব।) এর ভর 5.97×10^{24} kg, ব্যাস 12.742 km। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা আরামদায়ক 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এর অক্ষ 23.5 ডিগ্রিতে হেলানো তাই এখানে বৈচিত্র্যময় ঋতু আছে। পৃথিবীর একটি বিশাল চাঁদ রয়েছে যেটি পৃথিবীকে তার কক্ষপথে স্থিতিশীল থাকতে সাহায্য করে। সবচেয়ে বড় কথা পৃথিবী পৃষ্ঠে বিশাল

পরিমাণ পানি রয়েছে (ছবি 3.4) যেটি প্রায় চার বিলিয়ন বছর আগে প্রাণের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করেছিল। আমাদের জানামতে সৌরজগতে এখন পর্যন্ত শুধু পৃথিবীতেই প্রাণের বিকাশ হয়েছে।

আমরা সবাই জানি পৃথিবীর একদিন হয় 24 ঘণ্টায় এবং এক বছর হয় 365 দিনে (আসলে 365.25 দিনে তাই প্রতি চার বছর পর পর ফেব্রুয়ারি মাসে একটি বাড়তি দিন যোগ করে বছরের হিসাব ঠিক রাখতে হয়) পৃথিবীর একটি বায়ুমণ্ডল আছে যেখানে 78% নাইট্রোজেন এবং 21% অক্সিজেন এবং বাকী অন্যান্য গ্যাস মিলিয়ে 1%। এই বায়ুমণ্ডল শুধু যে আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে জীবন বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে তা নয়, মহাজগত থেকে ছুটি আসা উল্কা ধুমকেতুর আঘাত থেকেও রক্ষা করে। শুধু তাই নয় বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তর সূর্য থেকে আসা UV থেকে রক্ষা করে! পৃথিবী কেন্দ্রে থাকা লোহা আর নিকেলের কারণে এটির ঘূর্ণনে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয়, সেটি পৃথিবীকে ঘিরে একটা চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করেছে, যেটি সূর্য থেকে আসা সৌর-কণা (আয়ন) থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে।

পৃথিবী আমাদের আবাসভূমি। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার আমরা অবিবেচকের মতো এই পৃথিবীর স্বাভাবিক প্রকৃতিকে ধ্বংস করে এর আবহাওয়া এবং পরিবেশকে ধীরে ধীরে দূষিত করে ফেলছি। পৃথিবী সৌরজগতের একমাত্র গ্রহ যেটি প্রাকৃতিক কারণে নয় মানুষের কারণে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

মঙ্গল (Mars)

মঙ্গল আমাদের চতুর্থ পাথুরের গ্রহ। আকাশে তাকালে খুব সহজেই এটিকে তার লাল রঙের জন্য চেনা যায়। এর পৃষ্ঠদেশে থাকা আয়রন অক্সাইডের জন্য এই রঙটি এসেছে।

এর আকার পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক। পৃথিবী সূর্য থেকে যত দূরে মঙ্গলগ্রহ তার থেকে দেড়গুণ বেশি দূরে (1.5AU) তাই সূর্যের আলো পৌঁছায় খুব কম, সে কারণে এর গড় তাপমাত্রাও খুব কম—শূন্যের নিচে 65 ডিগ্রি। মঙ্গলের আবহাওয়া মরুভূমির মতো, তাই দিনের বেলা তাপমাত্রা বেড়ে 20 ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। পৃথিবীর সাথে মঙ্গল গ্রহের বেশ কিছু মিল আছে, মঙ্গল গ্রহের একদিন পৃথিবীর প্রায় সমান। পৃথিবীর মতো এর অক্ষও কক্ষপথের সাথে 25.2 ডিগ্রি হেলানো বলে মঙ্গলগ্রহের সুস্পষ্ট ঋতু আছে। মঙ্গল-বছর হচ্ছে পৃথিবী-বছরের প্রায় দ্বিগুণ, পৃথিবীর হিসেবে 687 দিন।

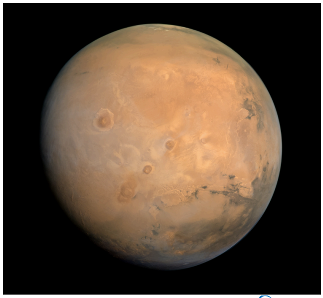

3.5 মঙ্গল গ্রহকে তার লালচে রঙ দিয়ে চেনা যায়।

অনুমান করা হয় বিলিয়ন বছর আগে মঙ্গল গ্রহের তাপমাত্রা আরও বেশি ছিল এবং এখানে প্রচুর পানি এবং ঘন বায়ুমণ্ডল ছিল এবং সম্ভবত কোন ধরণের প্রাণেরও বিকাশ ঘটেছিল, মঙ্গল গ্রহের আবহাওয়া শুক্রগ্রহের মতো ভয়ানক না হয়ে অনেকটা পৃথিবীর মতো হওয়ার কারণে পৃথিবী থেকে অনেক রকম মহাকাশযান মঙ্গল গ্রহে পাঠানো হয়েছে এবং সেগুলো খুবই চমৎকারভাবে মঙ্গল গ্রহের অনেক তথ্য আমাদের কাছে পাঠিয়েছে। মঙ্গল গ্রহে বেশিরভাগ কার্বন ডাই অক্সাইড এবং তুলনামূলকভাবে কম নাইট্রোজেন এবং আরগন গ্যাসের খুব পাতলা একটি বায়ুমণ্ডল আছে। বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর বায়ুচাপের মাত্র 0.6%। বায়ুমণ্ডল যথেষ্ট বড় না হওয়ার কারণে উল্কা কিংবা মহাজগতিক কণা নিয়মিতভাবে পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে এবং পৃষ্ঠদেশে পানি ধরে রাখতে পারে না। মঙ্গল গ্রহে এখন যতটুকু পানি রয়েছে সেটি রয়েছে তার দুই মেরুতে এবং মাটির নিচে। লোনা পানি যেহেতু অনেক কম

তাপমাত্রাতেও তরল অবস্থায় থাকে, তাই মনে করা হয় গ্রীষ্মকালে মেরু অঞ্চলের কিছু পানি গলে লোনা পানি হিসেবে প্রবাহিত হয়।

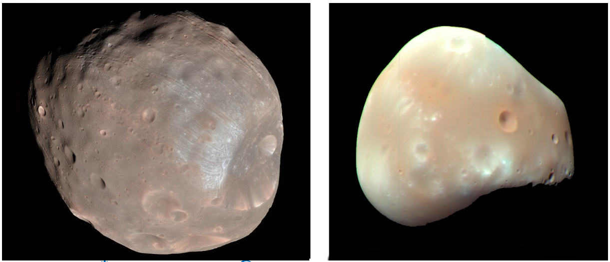

3.6 মঙ্গলের চাঁদ ফোবোস এবং ডিমোস।

মঙ্গল গ্রহের দুটি চাঁদ রয়েছে, ফোবোস (Phobos) এবং ডিমোস (Demose)। চাঁদ দুটির ভর খুব বেশি নয় বলে এরা ঠিক গোলাকার হতে পারেনি। ফোবোস নামের চাঁদটি পাঁচশো মিলিয়ন বছর পরে মঙ্গল গ্রহে আছড়ে পড়বে।

মঙ্গল গ্রহের পরের গ্রহ বৃহস্পতি এবং এই দুটি গ্রহের মাঝখানে রয়েছে গ্রহাণু বেল্ট যেখানে লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট গ্রহাণু রয়েছে। অনুমান করা হয়। অতীতে যখন গ্রহগুলো তৈরি হচ্ছিল তখন অতিকায় বৃহস্পতির মহাকর্ষ বলের কারণে এই গ্রহকণাগুলো একত্র হয়ে আরেকটি গ্রহ তৈরি করতে পারেনি। গ্রহাণূ বেল্টে ছোট ছোট নুড়ি পাথরের মতো গ্রহকণার সংখ্যা অগণিত, তবে এক কিলোমিটার থেকে বড় গ্রহকণার সংখ্যা এক থেকে দুই মিলিয়নের মতো।

বৃহস্পতি (Jupiter)

বুধ, শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গল এই চারটি পাথুরে গ্রহের পর শুরু হয়েছে চারটি অতিকায় গ্যাসীয় গ্রহ, তার মাঝে প্রথমটি বৃহস্পতি। এটি সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ, অন্য সবগুলো গ্রহ মিলে যত ভর হয়, বৃহস্পতির একার

ভর তার দ্বিগুণ থেকেও বেশি! বৃহস্পতি গ্রহের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় দশ গুণ (10.97) ধরে নিলে বৃহস্পতির ভর পৃথিবীর ভরের 1000 গুণ হওয়ার কথা। কিন্তু এটি পৃথিবীর মতো পাথুরে গ্রহ নয় এটি গ্যাসের গ্রহ তাই তার ভর পৃথিবীর ভরের প্রায় 300 গুণ। সূর্য থেকে পৃথিবী যত দূরে বৃহস্পতি তার থেকে 5 গুণ (5.2 AU) দূরে। সূর্য থেকে একটি গ্রহ যদি R দূরত্বে থাকে তাহলে তার সূর্যকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করার সময় $(T = R \times \sqrt{R})$ হিসেবে বেড়ে যায়, সেভাবে হিসেব করলেই দেখা যাবে বৃহস্পতি-বছর হবে পৃথিবীর বছরের প্রায় 12 বছর। (তোমরা অন্য গ্রহের জন্যেও এটি পরীক্ষা করে দেখতে পার, দেখবে সব গ্রহের জন্যেই এটি সত্যি।)

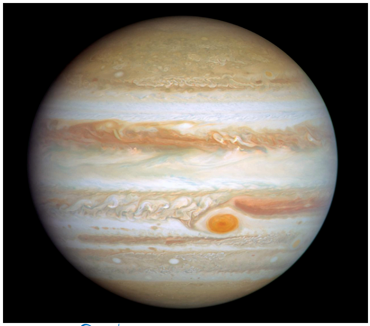
3.7 বৃহস্পতি সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ!

বৃহস্পতি অতিকায় একটি গ্রহ, সেই হিসেবে এটি ধীরগতিতে তার অক্ষ ঘিরে ঘোরার কথা, কিন্তু বিস্ময়করভাবে এটি মাত্র দশ ঘণ্টায় তার অক্ষকে ঘিরে ঘুরে। আসে—যেটি সৌরজগতের গ্রহগুলোর মাঝে দ্রুততম। এই গ্রহটির গঠনের সাথে সূর্যের গঠনের অনেক মিল আছে। দুটোই মূলত হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে তৈরি, সূর্য তার ভরের কারণে নক্ষত্রে রূপান্তরিত হয়েছে, বৃহস্পতির ভর কম বলে নক্ষত্র হতে পারেনি। সূর্যের ব্যাস বৃহস্পতির ব্যাস থেকে 10 গুণ বেশি, তাই তার আকার 1000 গুণ বেশি। যেহেতু দুটোরই গঠন মোটামুটি এক, তাই সূর্যের ভর বৃহস্পতির 1000 গুণ। বৃহস্পতির ব্যাস

চারগুণ থেকে একটু বেশি হলে তার ভর 70 থেকে 80 গুণ বেশি হতো, তাহলেই সেটি একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রে পরিণত হতে পারতো।

বৃহস্পতি যেহেতু একটি গ্যাসীয় গ্রহ, তাই পাথুরে গ্রহের মতো তার পৃষ্ঠদেশ বলে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু নেই। বৃহস্পতি গ্রহের বায়ুমণ্ডল রয়েছে এবং সেই বায়ুমণ্ডলে প্রতিনিয়ত ঝড় ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে। তাই আমরা বৃহস্পতি গ্রহের যে ছবি দেখি সেটি আসলে তার মেঘের উপরের অংশ। বৃহস্পতি গ্রহের যে অত্যন্ত স্পষ্ট একটি উপবৃত্তাকার লাল 'চোখ' রয়েছে সেটি আসলে প্রায় পৃথিবীর সমান একটি ঘূর্ণিঝড়, যেটি প্রায় সাতশত বছর থেকে রয়েছে। বৃহস্পতি গ্রহে যে সমান্তরাল ফিতার মতো বিভাজন দেখা যায় সেগুলো আসলে পরস্পর বিপরীত দিকে ধাবমান বাতাসের প্রবাহ। সূর্য থেকে অনেক দূরে হওয়ার কারণে বৃহস্পতি গ্রহের তাপমাত্রা কম, শূন্যের নিচে 110 ডিগ্রি।

বৃহস্পতি গ্রহের চারটি বড় বড় এবং প্রায় আশিটি ছোট ছোট চাঁদ রয়েছে। বৃহস্পতির আকার আকৃতি প্রকৃতি জীবন ধারণের জন্য একেবারেই অনুকূল নয় তবে তার বড় বড় চাঁদগুলো জীবন ধারণের জন্য সম্ভাব্য আবাসস্থল হতে পারে বলে মনে করা হয়। বৃহস্পতির সবচেয়ে বড় চাঁদটির নাম গ্যানিমিড (Ganymede), এটি সৌরজগতেরও বৃহত্তম চাঁদ। যদি বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ না করে এটি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করত তাহলে নিশ্চিতভাবে এটি একটি গ্রহ হতে পারত।

শনি (Saturn)

এটি দ্বিতীয় গ্যাসীয় গ্রহ এবং যারা গ্রহ সম্পর্কে একটু হলেও জানে তারা সবাই এই গ্রহটিকে আলাদা করে মনে রাখে কারণ এর খুব স্পষ্ট একটি রিং রয়েছে (ছবি 3.8)। আসলে চারটি গ্যাসীয় গ্রহেরই খুবই সূক্ষ্ম হলেও এক ধরনের রিং রয়েছে, কিন্তু কোনোটির রিংই শনিগ্রহের মতো এত স্পষ্ট নয়।

যেহেতু এটি সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ, এর ব্যাস পৃথিবীর ব্যাস থেকে 9 গুণ সে হিসেবে এর ভর হওয়ার কথা ছিল বৃহস্পতি গ্রহের অর্ধেক, কিন্তু এর ভর বৃহস্পতির ভরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। কাজেই এর ঘনত্ব সৌরজগতের গ্রহগুলোর মাঝে সবচেয়ে কম—পানি থেকেও কম! যার অর্থ যথেষ্ট বড় একটি বালতি যদি পাওয়া যায়, এবং সেখানে যদি শনিগ্রহকে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে শনি গ্রহ সেখানে ভেসে থাকবে!

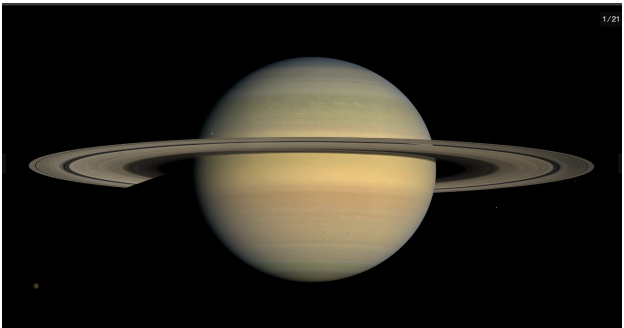

3.8 শনি গ্রহ তার চমকপ্রদ রিং দিয়ে সবার সাথে পরিচিত!

পৃথিবী সূর্য থেকে যত দূরে, শনি গ্রহ তার থেকে প্রায় 10 গুণ (9.58AU) দূরে। আমরা ($T = R \times \sqrt{R}$) নিয়ম ব্যবহার করে বলে দিতে পারি এক শনি-বছর হচ্ছে প্রায় ত্রিশ পৃথিবী-বছর (29.46 y)। এর অক্ষ প্রায় পৃথিবীর মতোই হেলানো, তাই সেখানে ঋতু পরিবর্তন হয়। শনিগ্রহের তাপমাত্রা শুন্যের নিচে 140 ডিগ্রি। বৃহস্পতি যেরকম তার অক্ষের উপর খুব দ্রুত ঘুরপাক খায়, শনিগ্রহও ঠিক সেরকম অত্যন্ত দ্রুত ঘুরপাক খায়। অর্থাৎ পৃথিবীতে যেরকম চব্বিশ ঘণ্টায় এক দিন-রাত শনি গ্রহে সেটি মাত্র 11 ঘণ্টা। শনি গ্রহ যেহেতু একটি গ্যাসীয় গ্রহ, তাই বৃহস্পতির মতোই সুনির্দিষ্টভাবে তার পৃষ্ঠদেশ বলে কিছু নেই। শনি গ্রহে বায়ুমণ্ডল রয়েছে এবং সেখানে মেঘ রয়েছে। সেই মেঘে

ঝড় এবং ঘূর্ণিঝড় হয়। তবে শনিগ্রহের সবচেয়ে বিচিত্র এবং রহস্যময় ব্যাপার হচ্ছে তার উত্তর মেরুতে ঘূর্ণিঝড়ের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকারের সুষম ষড়ভুজ (Hexagon) আছে (ছবি 3.9) , যেরকমটি আর কোনো গ্রহে নেই।

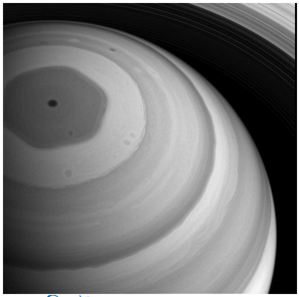

3.9 শনির উত্তর মেরুতে রহস্যময় ষড়ভুজ আকৃতির ঘূর্ণিঝড়।

শনিগ্রহের চাঁদের সংখ্যা আক্ষরিক অর্থে অসংখ্য—এখন পর্যন্ত 150টির মতো চাঁদ পাওয়া গেছে এবং সম্ভাব্য চাঁদের তালিকায় আরো রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। শনিগ্রহের সবচেয়ে বড় চাঁদ টাইটান (Titan) সৌরজগতে দ্বিতীয় বৃহত্তম চাঁদ।

শনিগ্রহের রিং সম্পর্কে আলাদাভাবে বলা না হলে এই গ্রহটি নিয়ে আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যাবে। যদিও আমরা এখন রিং ছাড়া শনিগ্রহ কল্পনাও করতে পারি না, কিন্তু শনিগ্রহের রিং কিন্তু গ্রহের হিসেবে খুবই সাময়িক এবং অস্থায়ী। যদিও শনিগ্রহের বয়স প্রায় 4.6 বিলিয়ন বছর কিন্তু তার রিং তৈরি হয়েছে মাত্র 10-100 মিলিয়ন বছর আগে। কোনো একটি চাঁদ শনিগ্রহের বেশি কাছাকাছি এসে সেটির প্রবল আকর্ষণে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে শনিগ্রহের রিং সৃষ্টি করেছে বলে অনুমান করা হয়। অর্থাৎ পৃথিবীতে যখন ডাইনোসোরেরা বিচরণ করছে তখন যদি কোন 'বিজ্ঞানী' ধরণের ডাইনোসর (!) একটি টেলিস্কোপ দিয়ে শনিকে দেখতো তাহলে সে দেখত রিংবিহীন একটি শনিগ্রহ! শুধু তাই নয়, এই রিংটি ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে আগামী 100 মিলিয়ন বছরে পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। শনিগ্রহের রিং মূলত বরফের কণা দিয়ে তৈরি সেজন্য এটি

চমৎকারভাবে সূর্যের আলো প্রতিফলন করে এবং দেখতে ধবধবে সাদা দেখায়। এটি শনিগ্রহের ব্যাস থেকেও প্রায় দ্বিগুণ, কিন্তু রিংটি আশ্চর্যরকম পাতলা, গড় পুরুত্ব মাত্র 10 মিটার। শনি গ্রহের বেশ কিছু চাঁদ তার রিংয়ের ভেতর দিয়ে শনি গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে!

ইউরেনাস (Uranus)

সৌরজগতের শেষ দুটি গ্রহ হচ্ছে ইউরেনাস এবং নেপচুন। এই গ্রহদুটো এত দূরে যে সেখানে এখনো মহাকাশযান পাঠিয়ে ভালোভাবে গ্রহটি পর্যবেক্ষণ করা আর সম্ভব হয়নি, কজেই সৌরজগতের সবগুলো গ্রহের মাঝে এই দুটো গ্রহ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা সবচেয়ে কম জানেন। এখন পর্যন্ত খুব কাছে থেকে তোলা ছবির মাঝে রয়েছে ভয়েজার 2 (Voyager 2) থেকে তোলা ছবি যেটি 1977 সালে দূরের গ্রহগুলো দেখার জন্য তার যাত্রা শুরু করে এবং 1986 সালে ইউরেনাসের কাছে পৌঁছায়। ইউরেনাস গ্রহ সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় তথ্যের বেশির ভাগ এসেছে ভয়েজার 2 থেকে (ছবি 3.11)।

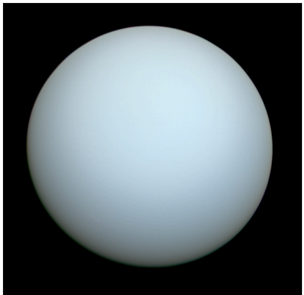

3.10 ইউরেনাস শুয়ে শুয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে!

এই গ্রহটি সম্পর্কে বলতে হলে সবাই প্রথম যে কথাটি বলে, সেটি হচ্ছে যে এই গ্রহটি অন্যান্য গ্রহের মতো খাড়া কিংবা প্রায় খাড়াভাবে তার অক্ষে ঘুরছে না। (শুক্র গ্রহ বিপরীত দিকে ঘুরলেও সেটিও প্রায় খাড়াভাবেই বিপরীত দিকে ঘুরছে।) ইউরেনাস গ্রহটি আসলে ‘শুয়ে শুয়ে’ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে অর্থাৎ এর অক্ষ প্রায় 97.8 ডিগ্রী হেলানো, সৌর সমতলের সাথে প্রায় সমান্তরাল।

সে কারণে ইউরেনাসের সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত খুবই বিচিত্র। গ্রীষ্মকালে সূর্য উদয় কিংবা অস্ত যায় না, মাথার উপর পাক খেতে থাকে, শীতকালে সূর্য উঠেই না! এবং গ্রীষ্ম ও শীতের মাঝামাঝি সময়ে এটি কখনো উত্তর দিক থেকে ওঠে দক্ষিণে অস্ত যায়, কখনো দক্ষিণ দিক থেকে উঠে উত্তর দিকে অস্ত যায় (পরিশিষ্ট 12.3)।

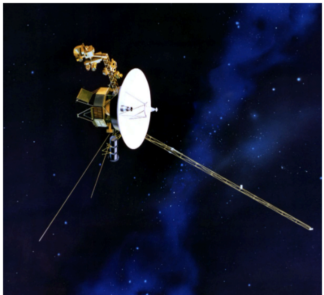
3.11 ভয়েজার 2 এখন সৌরজগতের বাইরে!

পৃথিবী সূর্য থেকে যত দূরে ইউরেনাস তার থেকে প্রায় 20 গুণ দূরে (19.58AU), তাই ইউরেনাস-বছর পৃথিবী-বছরে 84 বছর। যদিও ‘শুয়ে শুয়ে’ ঘুরছে তারপরেও সেটি ঘুরছে বেশ দ্রুত, তার নিজ অক্ষে একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে 17 ঘণ্টা। সূর্য থেকে অনেক দূরে বলে গ্রহটি স্বাভাবিকভাবেই খুব শীতল। গড় তাপমাত্রা শূন্যের নিচে 195 ডিগ্রি। গ্রহটি খুব শীতল বলে এর গ্যাস জমাট বেঁধে থাকে সেজন্য এটিকে শুধু গ্যাসীয় গ্রহ না বলে অনেক সময় বরফ-গ্রহ বলা হয়। গ্রহটি মূলত হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এবং মিথেন গ্যাস দিয়ে তৈরি। মিথেন গ্যাস নীল রং শোষণ করতে পারে না বলে ভয়েজার 2 থেকে পাঠানো ছবিতে দেখা যায় ইউরেনাসের রং হালকা নীল। ইরোনাসের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের চার গুণ, নেপচুন থেকে একটু বড় হলেও তার ভর নেপচুন থেকে কম। ইউরোনেসকে বাইরে থেকে দেখলে বৈচিত্র্যহীন মনে হলেও এর বায়ুমণ্ডল বৃহস্পতির মতোই উত্তাল, ঝড় ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে বাতাসের বেগ প্রায় 900 কিলোমিটারের মতো। অন্যান্য গ্যাসীয় গ্রহের মতোই ইউরেনাসের প্রায় ত্রিশটির মতো গ্রহ আছে। গ্রহটির কাছাকাছি চাঁদগুলো বরফ এবং পাথরের

তৈরি। শনি গ্রহের মতো চমকপ্রদ না হলেও এই গ্রহটির সূক্ষ্ম একটি রিং রয়েছে।

নেপচুন (Neptune)

নেপচুন সৌরজগতের শেষ গ্রহ। এই গ্রহের সাথে ইউরেনাসের অনেক মিল রয়েছে। গ্যালিলিও তার ছোট টেলিস্কোপ দিয়ে সেই 1612 সালে এটি প্রথম দেখেছিলেন, যদিও তখন তিনি এটিকে গ্রহ না ভেবে একটি নক্ষত্র মনে করেছিলেন। তারপর প্রায় দুইশত বছর পর এটি গ্রহ হিসেবে আবিষ্কৃত হয়। ইউরেনাসের কক্ষপথে একটুখানি বিচ্যুতি লক্ষ করে বিজ্ঞানীরা প্রথমে অনুমান করেছিলেন যে নিশ্চয়ই কাছাকাছি একটি গ্রহের কারণে কক্ষপথে এই বিচ্যুতিটি দেখা যাচ্ছে এবং হিসেব করে ঠিক যেখানে গ্রহটি পাওয়ার কথা বলে অনুমান করেছিলেন সেখানেই গ্রহটি পাওয়া গিয়েছিল। তবে ইউরেনাস কিংবা নেপচুন পৃথিবী থেকে অনেক দূরে বলে সেখানে মহাকাশযান পাঠানোর খুব সহজ নয়, কিন্তু নতুন টেলিস্কোপগুলোতে এদের ছবি তুলে গ্রহদুটো সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে (ছবি 3.12)।

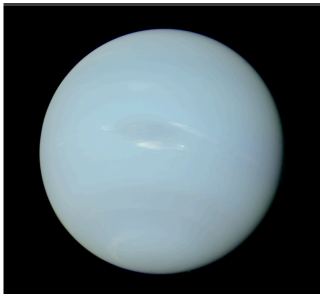

3.12 নেপচুন সৌরজগতের সবচেয়ে দূরের গ্রহ।

নেপচুনের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় 4 গুণ (3.86), ভর 17 গুণ। সূর্য থেকে দূরত্ব পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের প্রায় 30 গুণ। কাজেই নেপচুনের সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগবে 165 বছর। ইউরোনাসের মতোই এটিও হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এবং মিথেন গ্যাস দিয়ে তৈরি। ভয়েজার 2 থেকে

পাঠানো ছবিতে নেপচুনের রং পরিবর্তন করে এটাকে গাঢ় নীল দেখানো হয়েছিল, কিন্তু আসলে এর রঙ ঠিক ইউরেনাসের মতোই হালকা নীল। অন্যান্য গ্যাসীয় গ্রহের মতোই নেপচুনের নিজস্ব রিং রয়েছে। নেপচুন গ্রহের বায়ুমণ্ডল অনেক উত্তাল। এর পৃষ্ঠদেশে বাতাসের বেগ ঘণ্টা প্রায় 2000 কিলোমিটার।

এখন পর্যন্ত নেপচুনের প্রায় ষোলটা চাঁদ পাওয়া গেছে। তার মাঝে সবচেয়ে বড় চাঁদটির নাম ট্রাইটন (Triton)।

4. প্রথম এক্সোপ্ল্যানেট

সূর্যকে ঘিরে যে আটটি গ্রহ ঘুরছে তার মাঝে একটি গ্রহের মাঝে বৈচিত্র্যময় প্রাণের বিকাশ হয়েছে। শুধু তাই নয় সেই বৈচিত্র্যময় প্রাণের মাঝে রয়েছে হোমোস্যাপিয়েন প্রজাতি বা মানুষ, যাদের বুদ্ধিমত্তারও বিকাশ হয়েছে। বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য গ্যালাক্সির ছায়াপথ নামে একটি সাধারণ গ্যালাক্সির সুর্য নামে একটি সাদামাটা নক্ষত্রের গ্রহমণ্ডলীর পৃথিবী নামে অতি ক্ষুদ্র একটি

4.1 বাম দিকে অত্যন্ত চমকপ্রদ শৈল্পিক ভাবে আঁকা ভুল পৃথিবীকেন্দ্রিক সৌরজগৎ। ডান দিকে কোপার্নিকাসের অত্যন্ত সাদামাটা সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগৎ, যেটি মানবজাতির জন্য সবচেয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কারের একটি!

গ্রহের ক্ষুদ্র একটি মানুষ হয়েও তারা বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে শুরু করে

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু পরমাণুর রহস্য ভেদ করতে শিখেছে—এর থেকে বিস্ময়কর ব্যাপার আর কী হতে পারে? কিন্তু এই অবিশ্বাস্য সৌভাগ্যের অধিকারী কি শুধু আমরা একা? আমরা আকাশের দিকে তাকালেই অসংখ্য নক্ষত্র দেখতে পাই, সেই নক্ষত্রকে ঘিরে কি গ্রহমণ্ডলী রয়েছে? সেই গ্রহমণ্ডলীর কোনোটিতে কি প্রাণের বিকাশ হয়েছে? সেই প্রাণের মাঝে কোনোটিতে কি বুদ্ধিমত্তার বিকাশ হয়েছে? সেই বুদ্ধিমত্তা কোনোটি কী মানুষের সমান কিংবা বেশি হতে পেরেছে?

এই বিষয়টি নিয়ে সেই প্রাচীনকাল থেকে আলোচনা চলছিল। কিন্তু প্রাচীন যুগের 'গুণী' মানুষেরা এবং পরবর্তীতে ধর্ম একরকম জোর করে ঘোষণা করে রেখেছে যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র হচ্ছে পৃথিবী (ছবি 4.1)। পৃথিবীকে ঘিরে সবকিছু ঘুরছে এবং মানুষ হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। তাই পৃথিবীর মানুষ বহুকাল অন্যকিছু চিন্তা করার সুযোগ কিংবা সাহস পায়নি। যখন মানুষ তথ্য প্রমাণ দিয়ে বিজ্ঞান এবং গণিত ব্যবহার করে প্রকৃতির রহস্য

4.2 কোপার্নিকাস, ব্রুনো এবং গ্যালিলিও।

উদঘাটন করতে শুরু করেছে তখন বিজ্ঞানীরা প্রথমবার প্রচলিত বিশ্বাসের বাইরে কথা বলতে শুরু করেছিলেন। কাজটি মোটেও সহজ ছিল না। কোপার্নিকাস শুরু করেছিলেন, কিন্তু তার বইটি প্রচার হওয়ার আগেই তিনি মারা গিয়ে 'বেঁচে' গিয়েছিলেন। কিন্তু কোপার্নিকাসের বক্তব্যের পক্ষে কথা

বলার জন্য ব্রুণোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, গ্যালিলিওকে তার মুখ বন্ধ করে ঘর-বন্দী করে রাখা হয়েছে। গ্যালিলিওকে ক্যথলিক চার্চ আনুষ্ঠানিক ভাবে ক্ষমা করেছে মাত্র সেদিন—1992 সালে!

অবশ্য বিজ্ঞানের যুক্তিতর্ক আর প্রমাণের বিরুদ্ধে এখন আর কারও দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। শুধু তাই নয় বিজ্ঞানের যথেষ্ট উদারতাও আছে, নতুন বিজ্ঞান এসে পুরাতন বিজ্ঞানকে শুধু পরিবর্তন করতে পারে না, প্রয়োজন হলে তাকে অপসারণও করে দিতে পারে। বিজ্ঞানের হাত ধরে প্রযুক্তি এসেছে, সেই প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে। ভালো-বিজ্ঞান আর খারাপ-বিজ্ঞান বলে কিছু নেই, কিন্তু ভালো-প্রযুক্তি এবং খারাপ-প্রযুক্তি ঠিকই আছে। আমরা ভালো-প্রযুক্তির সুফল যেভাবে পাচ্ছি ঠিক সেরকম খারাপ-প্রযুক্তির অভিশাপও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

যাইহোক, যখন আমরা জানতে পেরেছি শুধুমাত্র দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই প্রায় ট্রিলিয়ন (10^{12}) গ্যালাক্সি রয়েছে এবং একটি গ্যালাক্সিতে প্রায় বিলিয়ন নক্ষত্র রয়েছে এবং সেই নক্ষত্রগুলোর একটি হচ্ছে আমাদের সূর্য। সেই সূর্যতেই আটটি গ্রহ রয়েছে তখন স্বাভাবিকভাবে মানুষের জানার কৌতূহল হয়েছে অন্য নক্ষত্রে গ্রহ আছে কী নেই। সবাই ভেবেছে গ্রহ থাকাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু বিজ্ঞান কখনোই শুধুমাত্র বিশ্বাস দিয়ে কোনো কিছু মেনে নেয় না। তাই বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হতে চাইলেন, সৌরজগতের বাইরে অন্য নক্ষত্রেও গ্রহ রয়েছে তার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রমাণ খুঁজতে শুরু করলেন।

কাজটি মোটেও সহজ নয়, আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে কাছাকাছি নক্ষত্রটিই 4 আলোকবর্ষ দূরে। আমাদের গ্যালাক্সির অন্য নক্ষত্রগুলো আরো বহু আলোকবর্ষ দূরে! নক্ষত্রগুলোকে আমরা দেখি আলোর একটি বিন্দু হিসেবে। নক্ষত্র ঘিরে যদি গ্রহ থাকে, তাদের আকার হবে নক্ষত্রের তুলনায়

অতি ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্র গ্রহের নিজস্ব কোনো আলো নেই, কাছাকাছি নক্ষত্র থেকে তার উপর আলো পড়ে যেটুকু আলো প্রতিফলিত হবে সেটি দিয়েই তাদের দেখতে হবে। শুধু তাই নয় একটি নক্ষত্রের চোখ ঝলসানো আলোর পাশে ক্ষুদ্র একটি নিষ্প্রভ গ্রহ দেখার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাহলে কী কোনোভাবে অন্য একটি নক্ষত্রের গ্রহ বা একটি এক্সোপ্ল্যানেটকে খুঁজে পাওয়া যাবে না?

বিজ্ঞানীরা এতো সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। তাই সরাসরি ভিন জগতের একটি গ্রহ বা এক্সোপ্ল্যানেটকে দেখতে পাওয়ার মতো প্রযুক্তি বিকশিত হওয়ার আগেই তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। প্রথম সুস্পষ্টভাবে সূর্যের মতো সাদামাটা একটি নক্ষত্রকে ঘিরে ঘুরতে থাকা একটি গ্রহের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন 1995 সালে। জ্যোতির্বিদ্যায় একটি নতুন অধ্যায় শুরু হলো সেদিন থেকে, যে অধ্যায়টি সম্ভবত বর্তমান জগতের সবচেয়ে চমকপ্রদ অধ্যায়গুলোর একটি।

সবার প্রথম যে গ্রহটিকে বিজ্ঞানীরা এক্সোপ্ল্যানেট হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন সেটার নাম 51 Pegasi b সংক্ষেপে 51 Peg b। এক্সোপ্ল্যানেটের নামকরণ পদ্ধতিটি খুবই সহজ, নক্ষত্রের নামের শেষে b, c, d… এই অক্ষরগুলো ব্যবহার করা শুরু হয় b থেকে। a অক্ষরটি কখনো ব্যবহার করা হয় না, ধরে নেয়া হয়, a অক্ষরটি হচ্ছে নক্ষত্রটির নিজের জন্য। যদি 51 Pegasi নক্ষত্রের আরও একটি গ্রহ খুঁজে পাওয়া যায় সেটি হবে 51 Pegasi c, এরপরেরটি হবে 51 Pegasi d, এভাবে চলতে থাকবে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ করতে হবে, b, c, d … এই অক্ষরগুলো নক্ষত্র থেকে কতদূরে তার উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয় না। কোনটি আগে এবং কোনটি পরে পাওয়া গেছে তার উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়। 51 Pegasi নক্ষত্রটি কাকতালীয়ভাবে পৃথিবী থেকে ঠিক 51 আলোকবর্ষ দূরে। যদিও আমাদের মনে হয় 51 আলোকবর্ষ অনেক দূরে কিন্তু নক্ষত্রের হিসেবে এটি আসলে একেবারে ঘরের কাছের একটি

নক্ষত্র! আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সির ব্যাস প্রায় একশো হাজার আলোকবর্ষ। নক্ষত্রটি প্রায় সূর্যের মতো, তার ভর সূর্য থেকে একটু বেশি ওর জন্য সে জন্য আলোর তীব্রতাও একটু বেশিকিন্তু অন্য যেকোনো হিসেবে নক্ষত্রটি ছিল সূর্যের মতো বৈশিষ্ট্যহীন সাদামাটা একটি নক্ষত্র।

এই নক্ষত্রকে ঘিরে ঘূর্নায়মান এক্সোপ্ল্যানেটটি যে পদ্ধতিতে বের করা হয়েছিল তার নাম রেডিয়াল ভেলোসিটি (Radial Velocity) পদ্ধতি। পরের অধ্যায়ে আমরা সেই পদ্ধতিটি নিয়ে আলোচনা করেছি।

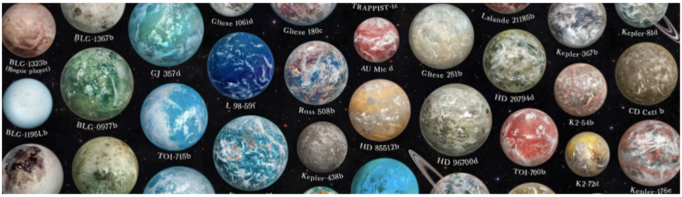

5. রেডিয়াল ভেলোসিটি পদ্ধতি

প্রথম এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কার হয়েছিল যখন দুজন বিজ্ঞানী নতুন বের হওয়া খুবই সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করতে পারে সেরকম একটি চমকপ্রদ স্পেক্টোগ্রাফ দিয়ে 51 Pegasi নক্ষত্রের খুবই সূক্ষ্ম টলমলে কম্পন (wobble) লক্ষ করেছিলেন। এখন নক্ষত্র কেন 'টলমল' করে কাঁপে এবং 'স্পেক্টোগ্রাফ' দিয়ে কী করে, এই দুটি বিষয়ই প্রথমে একটু ব্যাখ্যা করা দরকার।

আমরা সবসময় বলে এসেছি সূর্যের মহাকর্ষ বলের আকর্ষণে পৃথিবী কিংবা অন্য গ্রহগুলো সূর্যকে ঘিরে ঘুরে। যারা একটুখানি পদার্থবিজ্ঞান পড়েছে, তারা সবাই জানে, যে কোনো দুটি ভর আসলে একে অন্যকে 'সমান' মহাকর্ষ বলে আকর্ষণ করে অর্থাৎ সূর্য যেটুকু মহাকর্ষ বলে পৃথিবীকে আকর্ষণ করে পৃথিবীও ঠিক ততটুকু মহাকর্ষ বলে সূর্যকে আকর্ষণ করে। কিন্তু আমরা পৃথিবীকে সুর্যকে ঘিরে ঘুরতে দেখি, সূর্যকে পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরতে দেখি না। তার কারণটাও আমরা অনুমান করতে পারি। সূর্যের ভরের তুলনায় পৃথিবীর ভর অতি ক্ষুদ্র—প্রায় তিন লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও কম।

কিন্তু যদি সূর্যের সমান সমান ভরের আরেকটি নক্ষত্র সূর্যের মহাকর্ষ বলের আওতায় আসে, তখন কী হবে? সমান ভরের দুটি নক্ষত্র সমান বলে

পরস্পরকে আকর্ষণ করবে, কাজেই তখন দুটি নক্ষত্রকেই পরস্পরকে ঘিরে ঘুরতে হবে। কিন্তু কীভাবে? সেটি 5.1 ছবিতে দেখানো হয়েছে। দুটি নক্ষত্রই তখন তাদের দূরত্বের ঠিক মাঝামাঝি একটা বিন্দুকে ঘিরে ঘুরবে এবং দুটো নক্ষত্রই তখন সবসময় সেই বিন্দুর বিপরীত দিকে থাকবে। মাঝখানের এই বিন্দুটিকে বলে ভরকেন্দ্র বা সেন্টার অফ মাস (center of mass)। যদি একটুখানি পদার্থ বিজ্ঞান ব্যবহার করা যায় তাহলে আমরা দেখব যদি দুটি ভরের একটি অন্যটি থেকে একটু বেশি হয় তাহলে ভর কেন্দ্র বেশি-ভরের একটু কাছে চলে যাবে। তখনও দুটো ভর একটি আরেকটির বিপরীত দিকে থেকে তাদের ভর কেন্দ্র ঘিরে ঘুরবে।

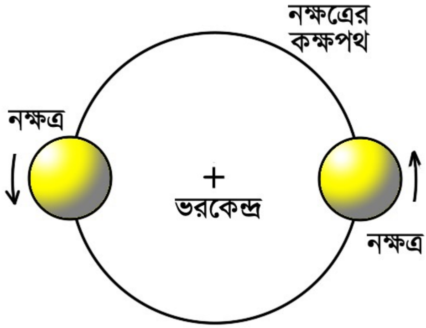

5.1 দুটি সমান ভরের নক্ষত্র তাদের ভরকেন্দ্রকে ঘিরে ঘুরছে।

আমাদের সৌরজগতে বৃহস্পতির ভর সবচেয়ে বেশি, সূর্যের ভরের 1000 ভাগের এক ভাগ, অন্য সবগুলো গ্রহের সম্মিলিত ভর বৃহস্পতির ভরের অর্ধেকের মত। তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে, শুধুমাত্র বৃহস্পতির কারণে সূর্য এবং বৃহস্পতির ভরকেন্দ্র সূর্যের কেন্দ্র থেকে তার পৃষ্ঠদেশে চলে এসেছে! (যদিও ভর বা গ্রহের সংখ্যা বেশি হলেও সম্মিলিত ভরগুলোর ভরকেন্দ্র কোথায় হবে সেটিও বের করা যায়, কিন্তু আমাদের আলোচনা সহজ

রাখার জন্য আমরা আপাতত শুধু সূর্য এবং বৃহস্পতি এই দুটি গ্রহের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখব।)

আমরা যদি শুধু সূর্য আর বৃহস্পতি গ্রহের কথা বিবেচনা করি, তাহলে দেখব সূর্য এবং বৃহস্পতি তাদের যে ভরকেন্দ্রকে ঘিরে ঘুরছে, সেই ভরকেন্দ্রটি মোটামুটিভাবে সুর্যের পৃষ্ঠদেশে। যেহেতু সুর্য এবং বৃহস্পতিকে সবসময় বিপরীত দিকে থাকতে হবে তাই ঘুর্ণনের সময় দুটিরই সমান। যদিও ভরকেন্দ্র থেকে সূর্যের দূরত্ব বৃহস্পতির দূরত্বের তুলনায় খুবই কম, কিন্তু সূর্য যে তার ভরকেন্দ্র ঘিরে ঘুরছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। খাড়া উপর থেকে দেখলে খুবই ছোট একটি ব্যাসার্ধে সুর্যকে ঘুরতে দেখা যাবে এবং একপাশ থেকে দেখলে সুর্যকে ডানে-বামে কাঁপতে দেখা যাবে (ছবি 5.2)।

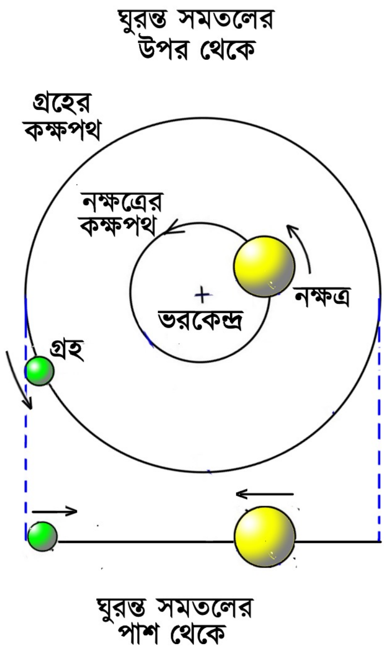

5.2 (উপরে) ভরকেন্দ্র ঘিরে গ্রহ ও নক্ষত্র ঘুরছে। (নিচে) পাশ থেকে দেখলে শুধু মাত্র ডানে-বামে কম্পনটি দেখা যাবে।

সূর্য-বৃহস্পতির জন্য যেটি সত্যি আমাদের গ্যালাক্সির অন্য নক্ষত্রের জন্যও সেটি সত্যি। কোনো নক্ষত্রকে ঘিরে যদি মোটামুটি বেশি ভরের একটি এক্সোপ্ল্যানেট ঘুরতে থাকে তাহলে সেটিও এভাবে নক্ষত্রটিকে তাদের ভরকেন্দ্রকে ঘিরে ঘোরায়। যেহেতু গ্রহটিকে দেখার উপায় নেই তাই বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের এই ঘূর্ণন বা কম্পনকে দেখে এক্সোপ্ল্যানেটের অস্তিত্ব প্রমাণ খুঁজে বের করতে চান।

এখন পর্যন্ত যুক্তিতে কোনো ভুল নেই, কিন্তু বহু আলোকবর্ষ দূর থেকে নক্ষত্রটিকে শুধু একটি আলোকবিন্দু হিসেবে দেখা যায়, তাই বাস্তবে নক্ষত্রের কোন রকম নড়াচড়া দেখা যায় না। (শুধু তার রঙ আর ঔজ্জ্বল্য পরিমাপ করা যায়।) তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে নড়াচড়া মাপার চেষ্টা না করে পরোক্ষভাবে নাড়াচাড়া বা কম্পনটুকু বের করে ফেলেন। সেটা বোঝার আগে আমাদের ডপলার শিফট নামে তরঙ্গের একটা বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে হবে।

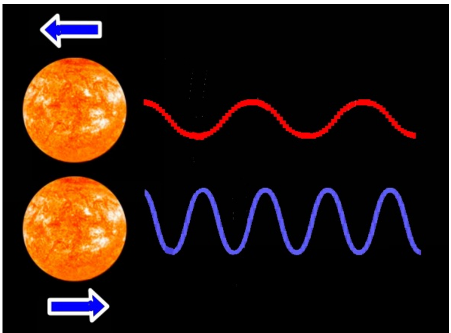

5.3 ডপলার শিফট: আলোর উৎসটি কোনদিকে যাচ্ছে তার উপর তরঙ্গের প্রসারণ (রেড-শিফট) বা সংকোচন (ব্লু-শিফট) নির্ভর করে।

আলো যেহেতু একটি তরঙ্গ তাই সেটিরও এই বৈশিষ্ট্যটি আছে। বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে: তরঙ্গের উৎস যদি আমাদের দিকে এগিয়ে আসে তাহলে আমরা দেখব তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে গেছে বা

সংকুচিত হয়ে গেছে এবং উৎসটি যদি সরে যায় তাহলে দেখব তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেড়ে গেছে বা প্রসারিত হয়ে গেছে (ছবি 5.3)। আলোর বেলায় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দিয়ে তার রঙ নির্ধারিত হয়। নীল (Blue) রঙয়ের আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কম, লাল (Red) রঙের আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেশি তাই আলোর উৎস যখন আমদের দিকে এগিয়ে আসার কারণে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কমে যায় সেটিকে বলে ব্লু-শিফট (Blue shift) এবং আলোর উৎসকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে যখন তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেড়ে যায় সেটিকে বলে রেড শিফট (Red shift)। শুধু তাই নয়, কতোটুকু ব্লু-শিফট বা রেড-শিফট হয়েছে দেখে আমরা উৎসটি কতো বেগে এগিয়ে আসছে বা পিছিয়ে যাচ্ছে সেটিও বের করে ফেলতে পারব। শব্দের বেলায় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দিয়ে নির্ধারিত হয় তার তীক্ষ্ণতা (Pitch)। তাই বাসার সামনে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে গভীর রাতে যদি সাইরেন বাজাতে বাজতে একটি এম্বুলেন্স ছুটে যায় তাহলে শুধুমাত্র সাইরেনের শব্দ শুনেই অনুমান করে ফেলা যায় কখন এম্বুলেন্সটি বাসার দিকে এগিয়ে আসছে এবং কখন দূরে সরে যাচ্ছে।

তোমরা সূর্য আর বৃহস্পতির ঘূর্ণনের বেলায় জেনেছ যে খাড়া উপর থেকে দেখলে সুর্যকে তার ভরকেন্দ্রকে ঘিরে ঘুরতে দেখবে কিন্তু একপাশ থেকে দেখলে সুর্যকে ডানে বামে কাঁপতে দেখা যাবে। যেহেতু বহু আলোকবর্ষ দূর থেকে নক্ষত্রের কোনো ধরণের নড়াচড়া বোঝারই উপায় নেই, তাই তাই তারা এমন নক্ষত্র-এক্সোপ্ল্যানেট জুটি বের করতে চাইতেন যেটি একপাশ থেকে দেখা যায়। সেখানেও নক্ষত্রের ডানে বামে কম্পনটি দেখা যাবে না, কিন্তু সেখানে অন্য একটা ব্যাপার ঘটে। 5.4 ছবিতে সেটি দেখানো হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে ঘুর্ণনের এক পর্যায়ে (A) সেটি আমাদের পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসে তখন নক্ষত্রের আলোকবিন্দুটির ব্লু-শিফট হয়। আবার অন্য পর্যায়ে (C) সেটি পৃথিবী থেকে দূরে সরে যায় তখন নক্ষত্রের আলোকবিন্দুটির রেড-শিফট হয়। A এবং D বিন্দুর মাঝখানে B এবং D বিন্দুতে নক্ষত্রটি

এগিয়েও আসছে না, পিছিয়েও যাচ্ছে না, এটি সমান্তরাল ভাবে ডানে কিংবা বামে যাচ্ছে, তাই সেখানে রেড-শিফট কিংবা ব্লু-শিফট কোনটাই হয় না। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকে।

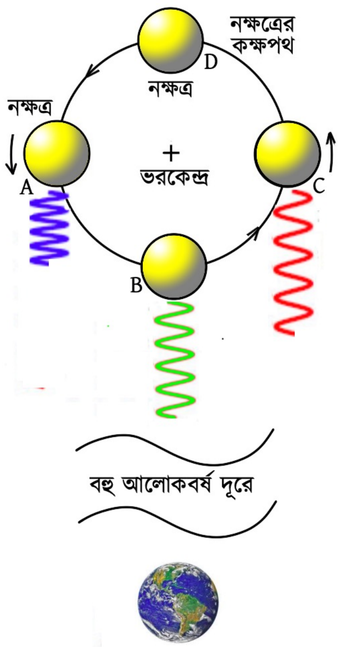

5.4 রেডিয়াল পদ্ধতিতে নক্ষত্রের আলোর ডপলার শিফট মেপে নক্ষত্রের কম্পন বের করা হয়।

আলোর রঙ যেহেতু তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দিয়ে নির্ধারিত হয় কাজেই বহু আলোকবর্ষ দূর থেকে নক্ষত্রের একটি আলোকবিন্দুর দিকে তাকিয়ে শুধুমাত্র আলোর রঙ বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিশ্লেষণ করে বলে দেওয়া যাবে নক্ষত্রটি কী একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে নাকি কখনও এগিয়ে আসছে এবং কখনও পিছিয়ে যাচ্ছে। যদি দেখা যায় নক্ষত্রের আলোকবিন্দুটি থেকে যে আলো আসছে সেই আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট সময় পরে পরে বাড়ছে এবং কমছে, তাহলে ধরে নেওয়া হয় নক্ষত্রটিকে ঘিরে একটি এক্সোপ্ল্যানেট ঘুরছে। সে কারণে নক্ষত্রটি তাদের ভর কেন্দ্রকে ঘিরে ঘুরছে।

এখন আমাদের শুধু একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, সেটি হচ্ছে নক্ষত্রের আলোকবিন্দু থেকে যে আলো আসছে সেই আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কি বাড়ছে না কমছে সেটি বিজ্ঞানীরা কেমন করে বুঝতে পারেন? তার জন্য খুবই সুক্ষ্মভাবে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘের পরিবর্তন বের করার জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় তার নাম স্পেকট্রোগ্রাফ (Spectrograph)। স্পেক্ট্রোগ্রাফ কীভাবে কাজ করে সেটি বুঝতে হলে আমাদের অন্য একটি বিষয় জানতে হবে।

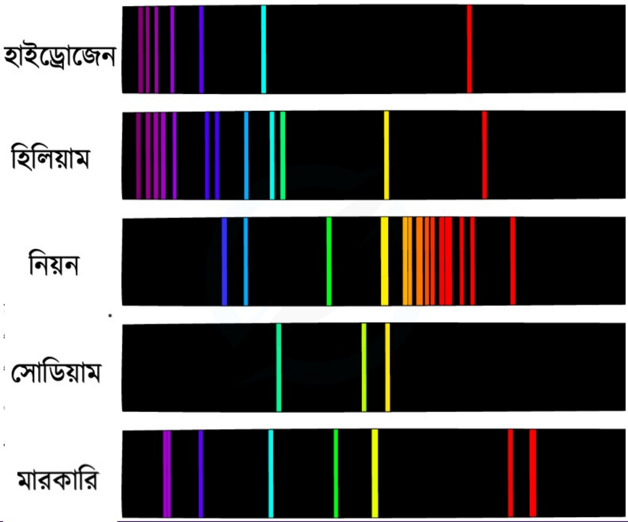

5.5 বিভিন্ন পরমাণুর স্পেকট্রাম।

কোনো আলোর উৎসে সাধারণত একটি মাত্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো থাকে না, আলোটি কীভাবে তৈরি হয়েছে তার উপর নির্ভর করে সেখানে সবগুলো কিংবা অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো থাকে। একটি নির্দিষ্ট পরমাণুর জন্য নির্দিষ্ট কিছু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থাকে কাজেই আলোটি কোন পরমাণু

থেকে এসেছে তার উপর নির্ভর করে সেখানে তখন সুনির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো দেখা যায়, যেটিকে সেই পরমাণুর স্পেকট্রাম বলা হয়। 5.5 ছবিতে এরকম কয়েকটি পরমাণুর স্পেকট্রাম দেখানো হয়েছে। (নিওন আলোর যে লালাভও রঙ দেখা যায় তার কারণটি এই স্পেক্ট্রামের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে।) আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি সৌন্দর্য হচ্ছে যে কাছের একটি গ্রহ বা নক্ষত্র থেকে শুরু করে বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের একটি গ্যালাক্সি বা কোয়াজার—সবকিছুই আমাদের পরিচিত 108 টি পরমাণু দিয়ে তৈরি। তাই বহুদূরের একটি নক্ষত্রের আলো স্পেকট্রোগ্রাফ দিয়ে বিশ্লেষণ করলেই আমরা বলে দিতে পারব সেই নক্ষত্রে কোন কোন পরমাণু আছে। কারণ একটি পরমাণুর স্পেকট্রাম তো আসলে শুধু একটি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো নয়, অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের-আলোর একটি সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ন। কাজেই অনেক আলোর মাঝখান থেকে একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্নের স্পেকট্রাম আলাদা করে ফেলা খুবই সহজ।

আমরা যদি এটুকু বুঝে থাকি, তাহলে কীভাবে কয়েক আলোকবর্ষ দূরের একটি নক্ষত্রের আলো দেখে তার বেগ বের করে ফেলা যায় সেটিও বুঝে ফেলতে পারব। ধরা যাক, আমরা একটি নক্ষত্রের আলো থেকে আলাদাভাবে হাইড্রোজেনের স্পেকট্রাম আলাদা করে ফেলেছি। হাইড্রোজেন যেহেতু নক্ষত্রের জ্বালানী তাই সব নক্ষত্রে প্রচুর হাইড্রোজেন থাকে, তাই হাইড্রোজেনের স্পেকট্রাম পাওয়া যাবেই। উৎস যখন স্থির থাকে তখন স্পেকট্রামটি কেমন হবে সেটি আমরা জানি পৃথিবীর ল্যাবরেটরিতে হাইড্রোজেনের স্পেকট্রাম থেকে। এখন আমরা যদি দূর নক্ষত্রের আলো থেকে হাইড্রোজেনের স্পেকট্রাম বের করে সেটি পৃথিবীর ল্যাবরেটরি থেকে পাওয়া স্থির একটি উৎসের পাশাপাশি রাখি, তাহলে আমরা নিচের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের (ছবি 5.6) যে কোন একটি দেখতে পাব:

5.6 (উপরে) আলোর উৎস কাছে আসার কারণে স্পেকট্রাম সংকুচিত হয়েছে (ব্লু-শিফট), (নিচে) আলোর উৎস সরে যাওয়ার কারণে স্পেকট্রাম প্রসারিত হয়েছে (রেড-শিফট), (মাঝখানে) আলোর উৎস স্থির থাকর কারণে স্পেকট্রাম অপরিবর্তিত রয়েছে।

(1) স্পেকট্রাম দুটি একই রকম-যার অর্থ পৃথিবীর সাপেক্ষে সেই নক্ষত্রটি স্থির, কিংবা পৃথিবীর সমান্তরালভাবে গতিশীল। 5.4 ছবিতে C কিংবা D অবস্থানে, সে কারণে পৃথিবীর দিকে কোনো ডপলার শিফট হয়নি।

(2) স্পেকট্রামটি সংকুচিত হয়েছে বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কমে এসেছে যার অর্থ নক্ষত্রটি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। 5.4 ছবিতে A অবস্থানে, সে কারণে পৃথিবীর দিকে ব্লু-শিফট হয়েছে।

(3) স্পেকট্রামটি প্রসারিত হয়েছে অর্থাৎ স্পেকট্রামের প্রত্যেকটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেড়ে গেছে-যার অর্থ নক্ষত্রটি আমাদের থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। 5.4 ছবিতে C অবস্থানে, সে কারণে পৃথিবীর দিকে রেড-শিফট হয়েছে।

কাজেই গ্রহটি প্রদক্ষিণ করার জন্য যদি নক্ষত্রটি ঘুরতে থাকে, তাহলে নক্ষত্রের ঘূর্ণনের সমতল থেকে নক্ষত্রটির এক বিন্দু আলোর দিকে তাকিয়ে থাকলে

দেখা যাবে আলোটির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নিয়মিত সময় পরে পরে একবার বেড়ে যাচ্ছে, আরেকবার কমে যাচ্ছে (ছবি 5.7)। একবার বেড়ে যাওয়া থেকে পরেরবার পর্যন্ত বেড়ে যাওয়ার সময়টি নক্ষত্রের পুরো একবার ঘুরে আসার সমান। আবার গ্রহটিরও বিপরীত দিকে থেকে একবার নক্ষত্রকে ঘুরে আসার সমান। যার অর্থ এই পদ্ধতিতে আমরা যে শুধু একটি গ্রহের অস্তিত্বের কথা জানতে পেরেছি তা নয়, গ্রহটির নক্ষত্রকে একবার ঘুরে আসতে কতক্ষণ সময় নেয় সেটিও জেনে গেছি। কয়েক আলোকবর্ষ দূর থেকে কেউ যদি সূর্যকে লক্ষ করে বৃহস্পতির অস্তিত্ব বের করতে চাইতো তাহলে তাদের বারো বছর সময় সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো! কারণ বৃহস্পতিকে একবার সূর্যকে ঘিরে আসতে বারো বছর সময় লাগে।

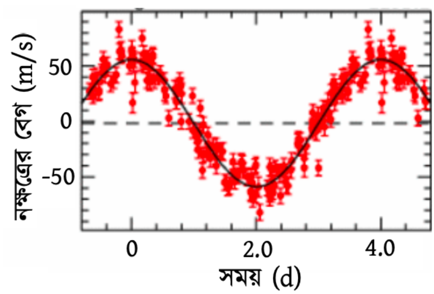

5.7 নক্ষত্রের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন থেকে নক্ষত্রের বেগ বের করা হয়েছে।

আমরা সৌরজগতে গ্রহ আলোচনা করার সময় দেখেছি যে, আমরা যদি সূর্য থেকে গ্রহটির দূরত্ব জানি তাহলে গ্রহটি কতদিনের সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসবে, সেটা বের করে ফেলতে পারি ($T = R \times \sqrt{R}$) কাজেই তার উল্টোটাও সত্যি-আমরা যদি একটি নক্ষত্রকে ঘিরে গ্রহের প্রদক্ষিণ করার সময়টি জানি তাহলে গ্রহটি নক্ষত্র থেকে কতদূরে সেটি বের করে ফেলতে পারব। আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি নক্ষত্রের আলোর রঙ থেকে নক্ষত্রটির ভর অনুমান করা যায়, তার তাপমাত্রা এমনকি ব্যাসার্ধও পর্যন্ত অনুমান করা যায়। আবার নক্ষত্রটির তাপমাত্রা এবং নক্ষত্র

থেকে দূরত্ব থেকে গ্রহটির তাপমাত্রাও বের করে ফেলতে পারব। এক কথায় গ্রহটি সম্পর্ক যাবতীয় তথ্য বের করে ফেলতে পারব।

যারা কষ্ট করে এবং ধৈর্য ধরে এতটুকু পড়ে এসেছে তাদের পুরো প্রক্রিয়াটি বোঝার জন্য এই রেডিয়াল ভেলোসিটি পদ্ধতির ভিন্ন ভিন্ন ধাপগুলো আরও একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক:

(1) নক্ষত্রের রং এবং ঔজ্জ্বল্য থেকে নক্ষত্রের ভর বের করা যায়।
(2) রেডিয়াল ভেলোসিটি পদ্ধতিতে নক্ষত্রের আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের নিয়মিত সংকোচন এবং প্রসারণ থেকে নক্ষত্রের ঘূর্ণন-বেগ এবং ঘূর্ণন-কাল বের করা যায়। এই দুটি তথ্য ব্যবহার করে নক্ষত্রের ভরকেন্দ্র থেকে নক্ষত্র কতদূরে সেটি বের করা যায়।
(3) নক্ষত্রের ঘূর্ণন কাল যেহেতু গ্রহেরও ঘূর্ণনকাল, তাই নক্ষত্রের ভর এবং গ্রহের ঘূর্ণনকাল ব্যবহার করে ভরকেন্দ্র থেকে গ্রহের দূরত্ব বের করা যায়।
(4) যেহেতু এই পর্যায়ে ভরকেন্দ্র থেকে নক্ষত্র এবং গ্রহের দূরত্ব এবং তার সাথে সাথে নক্ষত্রের ভর জানা হয়ে গেছে। তাই এগুলো থেকে গ্রহের ভর বের করা যায়। গ্রহের ভর বিশ্লেষণ করে বলা সম্ভব এটি পাথুরে নাকি গ্যাসীয় গ্রহ।
(5) নক্ষত্রের রং এবং ঔজ্জ্বল্য থেকে ভরের সাথে সাথে তার ব্যাসার্ধ এবং তাপমাত্রা বের করা যায়। নক্ষত্রের ব্যাসার্ধ্য, তাপমাত্রা এবং নক্ষত্র থেকে গ্রহের দূরত্ব থেকে গ্রহের তাপমাত্রা বের করা যায়।

কাজেই গ্রহটির অস্তিত্বের সাথে সাথে সেটির ভর এবং তাপমাত্রাও জানা হয়ে গেছে। রেডিয়াল ভেলোসিটি পদ্ধতিতে এক্সোপ্ল্যানেট সম্পর্কে নানা তথ্য বের

করার প্রক্রিয়াটিতে কোন তথ্য কীভাবে বের করা হয়, সেটি 5.8 ছবিতে দেখানো হলো।

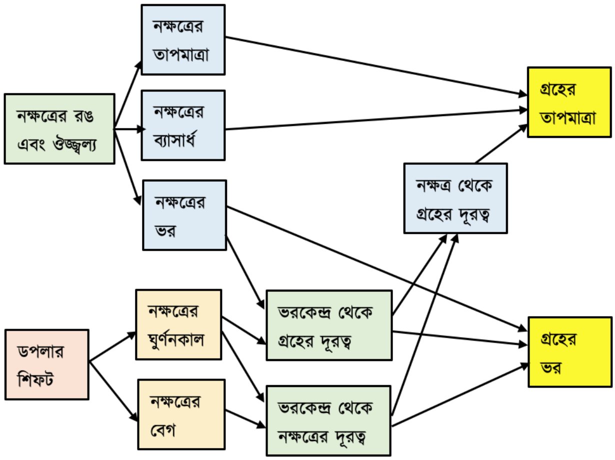

5.8 রেডিয়াল ভেলোসিটি পদ্ধতিতে এক্সোপ্ল্যানেটের বিভিন্ন তথ্য বের করার উপায়। কোন কোন তথ্য বের করার জন্য কোন কোন তথ্য বের করা হয়েছে সেটি দেখানো হয়েছে।

1995 সালে দুজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী যখন 51 Pegasi নক্ষত্রকে ঘিরে প্রথম একটি এক্সোপ্লানেটের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন (ছবি 5.9), তখন তারা সবিস্ময় দেখেছিলেন যে গ্রহটি বৃহস্পতির গ্রহের অর্ধেক ভরের একটি বিশাল গ্রহ, যেটি প্রতি চার দিনে একবার 51 Pegasi নক্ষত্রটিকে ঘিরে ঘুরছে। এই এক্সপ্ল্যানেটের নামকরণ করা হয়েছে 51 Pegasi b। এর ভর অনেক বেশি তাই এটির পৃথিবীর মতো পাথুরে গ্রহ হওয়া সম্ভব নয়, এটি বৃহস্পতির মতো গ্যাসীয় গ্রহ। তবে বৃহস্পতির মত শীতলগ্রহ নয়, নক্ষত্রের খুব কাছে থেকে ঘুরে বলে এর তাপমাত্রা প্রায় 1200 ডিগ্রি। এই গ্রহটিকে আবিষ্কার করার পর

গ্রহ সম্পর্কে অনেক প্রচলিত ধ্যান-ধারণা পাল্টে গেছে। 51 Peg b আবিষ্কার করার জন্য এই দুজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে 2019 সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

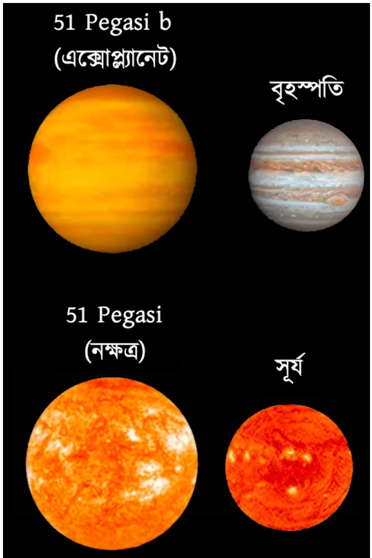

5.9 শিল্পীর দৃষ্টিতে 51 Pegasi b গ্রহ এবং তার নক্ষত্রের ছবি। পাশে তুলনা করার জন্য বৃহস্পতি এবং সূর্যকে দেখানো হয়েছে।

রেডিয়াল ভেলোসিটি পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রথম এক্সোপ্ল্যানেটটি আবিষ্কার করা হয়েছিল এবং পরে আরও অনেক এক্সোপ্ল্যানেট বের করা হয়েছে সত্যি, কিন্তু এই পদ্ধতির একটি বড় সমস্যা রয়েছে। এটি বের করার জন্য ভরকেন্দ্র ঘিরে নক্ষত্র এবং গ্রহের ঘূর্ণনটি এই ঘূর্ণনের সমতল থেকে দেখতে হয়। যদি খাড়াভাবে দেখার চেষ্টা করা হয় তাহলে কিছু দেখাই যাবে না! যদি একটি কোণ থেকে হেলান অবস্থায় দেখা হয় তাহলে ডপলার শিফটের মান হবে কম এবং সেটি ব্যবহার করে যখন গ্রহের ভর বের করা হয় তখন ভরটিও বের হয় কম। তাই এই পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয় যে এই ভরটি প্রকৃত ভর। যে ভরটি বের হয় সেটি হচ্ছে গ্রহটির সম্ভাব্য সর্বনিম্ন ভর, প্রকৃত ভর আরও বেশি হতে পারে।

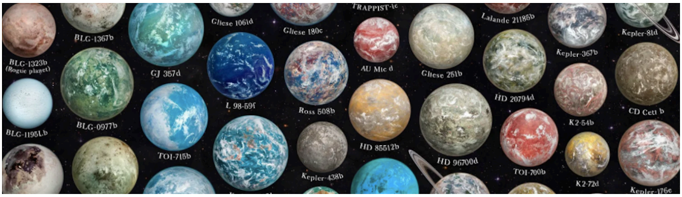

6. ট্রানজিট পদ্ধতি

রেডিয়াল ভেলোসিটি পদ্ধতিটি বোঝার জন্য আমাদের ভরকেন্দ্র, ডপলার-শিফট, পরমাণুর স্পেকট্রাম এরকম বেশ কয়েকটি বিষয় জানতে হয়েছে। কিন্তু ট্রানজিট ডিটেকশন পদ্ধতিটি এত সহজ একটি পদ্ধতি যে এটি বোঝার জন্য আমাদের নতুন কিছুই জানতে হবে না। দূরে যদি একটা আলো থাকে এবং অন্ধকার রাতে আমরা যদি সেই আলোটার দিকে তাকিয়ে থাকি, তখন যদি একটা পাখি আলোটার সামনে দিয়ে উড়ে যায়, আমরা পাখিটি দেখতে না পেলেও পাখিটির ছায়া দেখতে পাবো—বুঝতে পারব আলোর সামনে দিয়ে কিছু একটা উড়ে গেছে। এটাই হচ্ছে ট্রানজিট ডিটেকশন পদ্ধতি। এখানে আলো হচ্ছে বহু আলোকবর্ষ দূরে একটি নক্ষত্র এবং পাখিটি হচ্ছে একটি গ্রহ বা একটি এক্সোপ্ল্যানেট! একটি নক্ষত্রের সামনে দিয়ে যখন একটি গ্রহ যায় তখন যত কমই হোক, আলোর তীব্রতা একটুখানি কমে যায়। খালি চোখে সেটি আমাদের চোখে পড়বে না, কিন্তু অতি সূক্ষ্ম আলোর তীব্রতা মাপার যন্ত্রে সেটি ধরা পড়ে। গ্রহটি যদি বড় হয় এবং তার কক্ষপথ যদি নক্ষত্রের খুব কাছে হয়, তাহলে সেই গ্রহের ট্রানজিট হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বৃহস্পতির মতো বড় গ্রহ পাওয়ার সম্ভাবনা 10% এর মতো, পৃথিবীর মতো ছোটগ্রহ পাওয়ার সম্ভাবনা মাত্র ½%! তবে সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে নক্ষত্রটি এবং গ্রহটিকে ঠিক আমাদের দৃষ্টির সাথে এক সরল রেখায় থাকতে হবে—

ঠিক রেডিয়াল পদ্ধতিতে যেরকম ছিল! একটু উপরে কিংবা নিচে হলেই আমরা সেটি দেখব না।

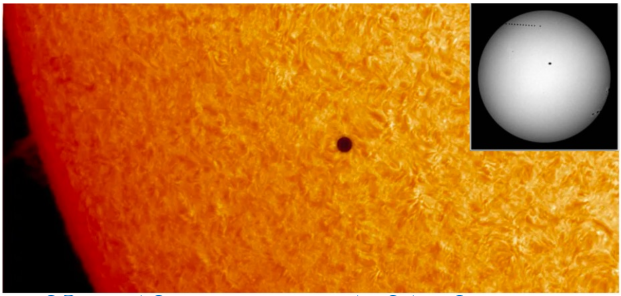

6.1 পৃথিবী থেকে টেলিস্কোপে তোলা বুধ গ্রহের ট্রানজিটের ছবি।

আমাদের সৌরজগতে পৃথিবী থেকে শুধু বুধ (ছবি 6.1) এবং শুক্র গ্রহের ট্রানজিট দেখতে পাব। অন্য গ্রহগুলোর কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরে বলে সূর্যের সামনে সেগুলোর ট্রানজিট দেখার কোন সুযোগ নেই।

একটি গ্রহ যখন একটি নক্ষত্রের সামনে দিয়ে যায় তখন নক্ষত্রের আলোর তীব্রতার পরিবর্তনটির একটি প্যাটার্ন আছে। (ছবি 6.2) যখন নক্ষত্রের সামনে কোনো গ্রহ নেই তখন নক্ষত্রের আলোর কোনো তারতম্য হয় না অর্থাৎ একটি লেখচিত্রে আলোর তীব্রতাকে সময়ের সাথে দেখলে একটি সরল রেখায় দেখা যাবে। গ্রহটি যখন নক্ষত্রের সামনে আসতে থাকে তখন নক্ষত্রের আলোর তীব্রতা কমতে থাকে। যখন পুরো গ্রহটি নক্ষত্রের সামনে এসে হাজির হয় তখন আলোর তীব্রতা তার সর্বনিম্ন অবস্থায় পৌঁছায়। যতক্ষণ গ্রহটি নক্ষত্রের সামনে থাকে ততক্ষণ আলোর তীব্রতা একই থাকে, যখন গ্রহটি নক্ষত্রের সামনে থেকে সরে যেতে থাকে তখন আবার আলোর তীব্রতা বাড়তে থাকে এবং যখন গ্রহটি নক্ষত্রের সামনে থেকে পুরোপুরি সরে যায় তখন নক্ষত্রের

আলোর তীব্রতা আবার আগের মানে পৌঁছে যায়। গ্রহের প্রস্থচ্ছেদ যত বেশি হবে সেটির জন্য আলোর তীব্রতা তত কমে যাবে । আবার গ্রহটি যত দূরে থাকবে সেটি তত ধীর গতিতে নক্ষত্রটিকে প্রদক্ষিণ করবে, কাজেই ট্রানজিটের সময় দেখে মোটামুটি ভাবে বলে দেওয়া যায় গ্রহটি কী নক্ষত্রের কাছে না দূরে।

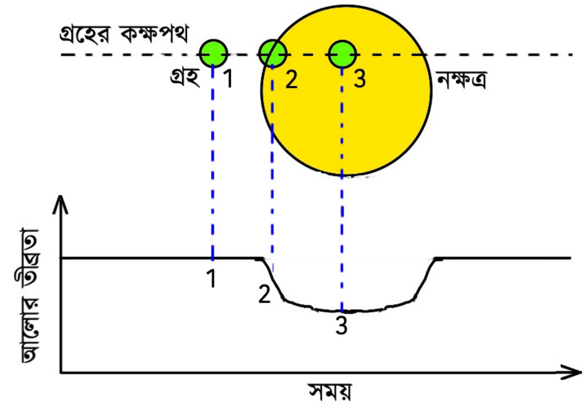

6.2 নক্ষত্রের সামনে গ্রহের ট্রানজিটের কারণে আলোর তীব্রতার পরিবর্তন।

বৃহস্পতির ব্যাসার্ধ সূর্যের ব্যাসার্ধের 10 ভাগের এক ভাগ, তাই বৃহস্পতির প্রস্থচ্ছেদ সূর্যের প্রস্থচ্ছেদের 100 ভাগের একভাগ বা 1% যার অর্থ যখন বৃহস্পতি সূর্যের সামনে আসে তখন সূর্যের আলোর তীব্রতা 1% কমে যায়। বহু আলোকবর্ষ দূর থেকে কেউ যদি সূর্য এবং বৃহস্পতিকে এক সরল রেখায় দেখে তাহলে বৃহস্পতিকে দেখতে না পেলেও দেখবে সূর্যের আলোর তীব্রতা 1% কমে গিয়েছে সেটি দেখতে পাবে। পৃথিবীর প্রস্থচ্ছেদ হচ্ছে সূর্যের প্রস্থচ্ছেদের 10,000 ভাগের এক ভাগ, তাই বহুদূর থেকে কেউ যদি সূর্যের

সামনে পৃথিবীর ট্রানজিট লক্ষ করে তখন দেখবে সূর্যের আলোর তীব্রতা 0.01% কমেছে।

Trappist-1 নামে একটি নক্ষত্রের একটি-দুটি নয় সাতটি এক্সোপ্ল্যানেট পাওয়া গেছে! 6.3 ছবিতে সেই সাতটি গ্রহের ট্রানজিটের সময় আলোর তীব্রতার পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। তোমরা পরিবর্তনগুলো লক্ষ করলে সহজেই কোন

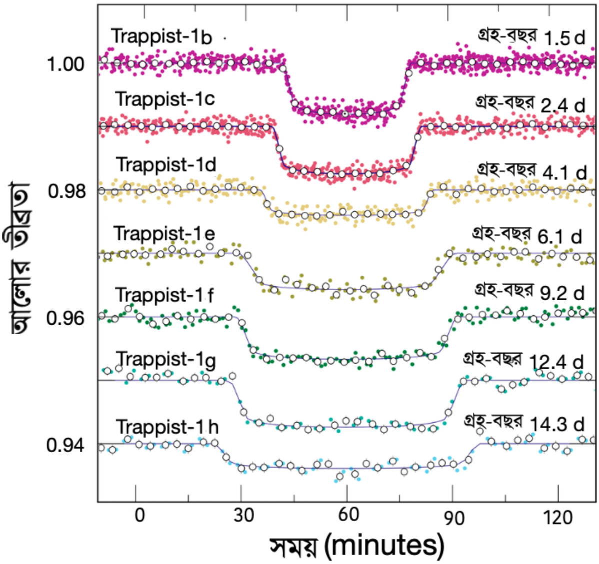

6.3 Trappist-1 নক্ষত্রে 7 টি এক্সোপ্ল্যানেটের ট্রানজিট।

এক্সোপ্ল্যানেটের প্রস্থচ্ছেদ সবচেয়ে বেশি এবং কোনটির সবচেয়ে কম বলে দিতে পারবে। আবার কতো সময় ধরে ট্রানজিট হচ্ছে দেখে কোন এক্সোপ্ল্যানেট সবচেয়ে কাছে এবং কোনটি সবচেয়ে দূরে সেটিও বলে দিতে পারবে!

ট্রানজিট পদ্ধতিতে অনেকসময় কয়েকশত আলোকবর্ষ দূরের একটি নক্ষত্রের আলোর তীব্রতা মাপা হয়, বুঝতেই পারছ কাজটি কঠিন। নক্ষত্রের সামনে একটি গ্রহের উপস্থিতি ছাড়াও অন্যান্য কারণেও আলোর তীব্রতা বাড়তে বা কমতে পারে। কাজেই এটি যে আসলেই গ্রহের উপস্থিতি সেটি নিশ্চিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। সেটি করার প্রথম প্রক্রিয়া হচ্ছে দীর্ঘ সময় থেকে নক্ষত্রটির আলোর তীব্রতার উপর চোখ রাখা। গ্রহটি যেহেতু নক্ষত্রকে ঘিরে তার কক্ষপথে ঘুরতে থাকবে, তাই সত্যিকারের ট্রানজিট হলে গ্রহটি বারবার নক্ষত্রের সামনে আসতে থাকবে এবং আলোর তীব্রতা কমে যাওয়ার ব্যাপারটি

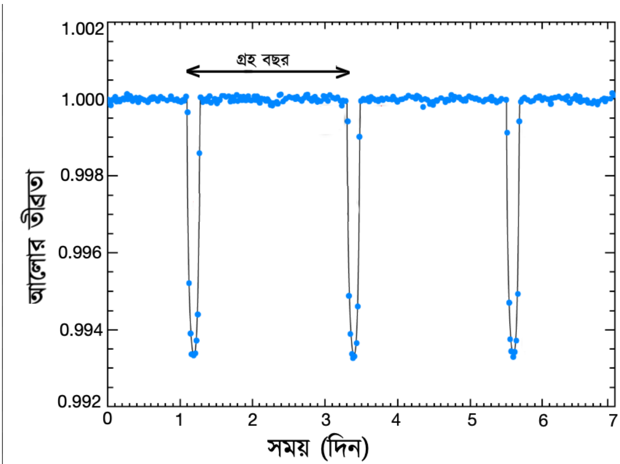

6.4 গ্রহের নিয়মিত ট্রানজিট থেকে গ্রহ-বছর বের হয়ে আসে।

আমরা নির্দিষ্ট সময় পরে পরে দেখতে পাব (ছবি 6.3)। এই প্রক্রিয়া শুধু যে একটি গ্রহের ট্রানজিট বোঝা যায় তা নয়, এই নিয়মিত আলোর তীব্রতা কমে যাওয়া এবং বেড়ে যাওয়া থেকে গ্রহটির কক্ষপথ ঘিরে আবর্তনের সময় বা, গ্রহ-বছরও বের হয়ে আসে। নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ যদি গ্রহ-বছর

অনেক বড় হয়, তাহলে অনেক দীর্ঘ সময় সেটি পর্যবেক্ষণ করতে হয়, যেটি অনেক কঠিন।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, রেডিয়াল ভেলোসিটি পদ্ধতি থেকে আমরা যেরকম গ্রহের ভর এবং গ্রহের আবর্তনের সময়—এই দুটি তথ্য পেয়েছিলাম, ট্রানজিট পদ্ধতি থেকে গ্রহের ভর সম্পর্কে সরাসরি কোনো তথ্য না পেলেও গ্রহের প্রস্থচ্ছেদ এবং তার আবর্তনের সময়, এই দুটি তথ্য পাচ্ছি। তবে এখানেই শেষ নয়, ট্রানজিট পদ্ধতি থেকে আমরা আরেকটি চমকপদ তথ্য পাই, সেটি হচ্ছে গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের তথ্য। যদি গ্রহটির বায়ুমণ্ডল থেকেও থাকে অনেক সময়েই গ্রহের আকারের তুলনায় তার পুরুত্ব হয় খুব কম। আমাদের পৃথিবীতে যেমন পৃথিবীর 6000 কিলোমিটার আর তার বায়ুমণ্ডলের পুরুত্ব মাত্র 100 কিলোমিটার, 2% থেকেও কম। কিন্তু তারপরেও ট্রানজিট পদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। কেমন করে ধরা পড়ে সেটি বুঝার জন্য ছোট একটি বিষয় জানতে হবে।

আমরা আগের অধ্যায়ে বলেছিলাম প্রত্যেকটা পরমাণুর নিজস্ব একটি স্পেকট্রাম থাকে। সে কারণে বহুদূরের কোনো আলোর উৎস থেকে আমরা সেই আলোর উৎস—গ্যালাক্সি, নক্ষত্র বা কোয়াজার, কোন মৌলিক পদার্থের পরামাণু দিয়ে তৈরি সেটি বলতে পারি, তখন পুরো ব্যাপারটি বলা হয়নি। যেটি বলা হয়নি, সেটি হচ্ছে এর উল্টো ব্যাপারটিও ঘটতে পারে। অর্থাৎ যদি কোনো গ্যাসের ভেতর দিয়ে সকল তরঙ্গ দৈর্ঘের আলো পাঠানো হয় তাহলে সেই গ্যাসের ভেতরে যে নির্দিষ্ট পরমাণু আছে সেগুলো বেছে বেছে তার স্পেকট্রামের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য শুষে নেবে। কাজেই একটি গ্যাসকে উত্তপ্ত করলে সেটি তার নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো সৃষ্টি করে, আবার সেই আলো শীতল গ্যাসের ভেতর দিয়ে আলো পাঠানো হলে আলো থেকে সেই একই তরঙ্গ

দৈর্ঘ্য শোষণ করে নেয়। 6.5 ছবিতে হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য এই বিষয়টি দেখানো হয়েছে।

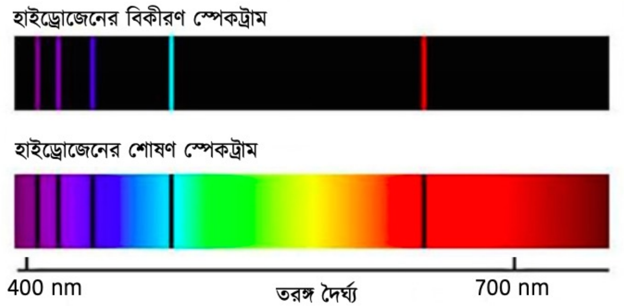

6.5 হাইড্রোজেনের বিকিরণ এবং শোষণ স্পেকট্রাম একটি অন্যটির বিপরীত প্রক্রিয়া।

কাজেই যদি শুধু নক্ষত্রের আলোর তীব্রতার কম-বেশি না দেখে গ্রহটি যখন নক্ষত্রের সামনে থাকে তখন আলোর স্পেকট্রামটিও বিশ্লেষণ করা হয় এবং তখন কোন কোন মৌলিক পদার্থের স্পেকট্রাম শোষিত হচ্ছে সেটি দেখা হয়, তখন দুটি বিষয় জানা যায়। একটি হচ্ছে গ্রহটির বায়ুমণ্ডল আছে কিনা এবং আরেকটি হচ্ছে যদি বায়ুমণ্ডল থেকে থাকে তাহলে সেই বায়ুমণ্ডলে কোন কোন মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি। এটি একটি অসাধারণ ঘটনা। আমরা ট্রানজিট পদ্ধতি থেকে গ্রহটির বায়ুমণ্ডল আছে কিনা শুধু সেই তথ্য নয় সেই বায়ুমণ্ডলে কী কী গ্যাস আছে সেটাও বের করে ফেলতে পারি।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, ট্রানজিট পদ্ধতিতে আমরা তিনটি তথ্য পাই, গ্রহটির ব্যাসার্ধ, গ্রহটির কক্ষপথে আবর্তনের সময় এবং গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের গঠন। যেহেতু নক্ষত্রের রঙ এবং ঔজ্জ্বল্য থেকে আমরা নক্ষত্রের তাপমাত্রা, ব্যাসার্ধ, এবং ভর পেয়ে যাই তাই ট্রানজিট পদ্ধতিতে পাওয়া গ্রহের ব্যাসার্ধ,

গ্রহের আবর্তনকাল, এবং গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্বের তথ্য ব্যবহার করে অন্য যেসব তথ্য বের করতে পারি সেগুলো 6.6 ছবিতে দেখানো হলো।

বিজ্ঞানের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেটি সবসময় একটি তথ্যকে সম্ভব হলে

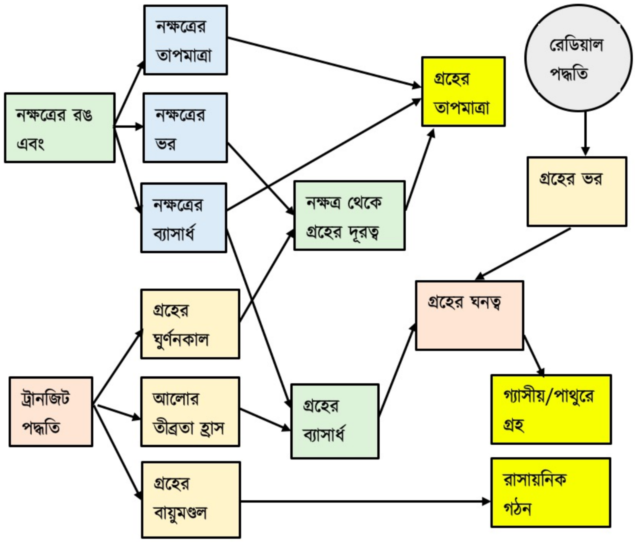

6.6 ট্রানজিট পদ্ধতিতে এক্সোপ্ল্যানেটের বিভিন্ন তথ্য বের করার উপায়। কোন কোন তথ্য বের করার জন্য কোন কোন তথ্য বের করা হয়েছে সেটি দেখানো হয়েছে।

ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে পরীক্ষা করে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চায়। আমরা যদি রেডিয়াল ভেলোসিটির তথ্যগুলো দেখি তাহলে সেখানে দেখব যে আমরা সেখানে গ্রহের ঘূর্ণনকাল এবং নক্ষত্র থেকে গ্রহের দূরত্ব বের করেছিলাম। ট্রানজিট পদ্ধতি থেকেও আমরা গ্রহের ঘূর্ণনকাল এবং নক্ষত্র থেকে গ্রহের

দূরত্ব বের করেছি কিন্তু সম্পুর্ণ ভিন্ন প্রক্রিয়ায়। কাজেই দুটি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে একই তথ্য বের করে সেটি নিশ্চিত হওয়া যায়।

6.8 কেপলার টেলিস্কোপে বের করা অসংখ্য এক্সোপ্ল্যানেটের কয়েকটি।

আবার, একই সাথে এই দুটো প্রক্রিয়া একটি আরেকটির পরিপূরক। কারণ রেডিয়াল ভেলোসিটি পদ্ধতিতে আমরা গ্রহের ভর বের করতে পারি কিন্তু ব্যাসার্ধ বের করতে পারি না। অন্যদিকে ট্রানজিট পদ্ধতিতে আমরা গ্রহের ব্যাসার্ধ বের করতে পারি কিন্তু ভর বের করতে পারি না। কিন্তু দুটি ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে, আলাদা ভাবে গ্রহের ভর এবং ব্যাসার্ধ বের করে গ্রহের ভরকে গ্রহের আয়তন দিয়ে ভাগ করে আমরা গ্রহের ঘনত্ব বের করতে পারি। গ্রহের ঘনত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য, কারণ এটি থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি গ্রহটি কী পাথুরে গ্রহ নাকি গ্যাসীয় গ্রহ। পাথুরে গ্রহ হলে ঘনত্ব

বেশি হবে, গ্যাসীয় গ্রহ হলে কম। রেডিয়াল পদ্ধতি আলোচনা করার সময় আমাদের শুধুমাত্র গ্রহের ভর থেকে অনুমান করতে হয়েছিল গ্রহটি কি পাথুরে নাকি গ্যাসীয়।

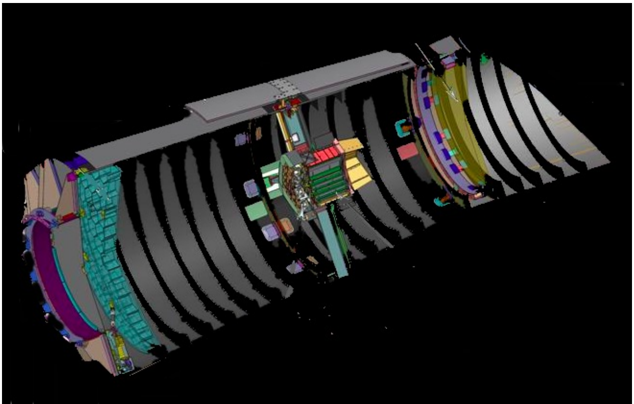

6.7 কেপলার টেলিস্কোপ।

এখন পর্যন্ত যত এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কার হয়েছে তার বেশিরভাগ ট্রানজিট পদ্ধতিতে প্রথমে বের করা হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে, কেপলার (Kepler) নামে একটি টেলিস্কোপকে ট্রানজিট পদ্ধতিতে এক্সোপ্লানেট বের করার জন্য মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল। মহাকাশে থাকার জন্য এটিকে অন্ধকার রাতের জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি, এটি দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা মহাকাশের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় তাকিয়ে থেকে প্রায় 150,000 নক্ষত্রের আলোর তীব্রতা পরিমাপ করেছে তার ভিতর থেকে অনেক ক্ষেত্রেই এক্সোপ্ল্যানেটের খোঁজ পেয়েছে। যেহেতু গ্রহটি বড় হলে এবং নক্ষত্রের কাছে থাকলে খুঁজে পাওয়া সহজ হয় তাই বেশিরভাগ নক্ষত্র ছিল উত্তপ্ত গ্যাসীয় গ্রহ। আমাদের সৌরজগতে কোন গ্রহই উত্তপ্ত গ্যাসীয় গ্রহ নয় তাই এই নক্ষত্রগুলোর জন্য

একটি নূতন নামকরণ করতে হয়েছে, সেটি হচ্ছে উত্তপ্ত-বৃহস্পতি বা হট-জুপিটার (Hot Jupiter)। তবে যেহেতু বিজ্ঞানীরা জানেন যে গ্যাসীয় বড় গ্রহ পাওয়ার সম্ভাবনা যখন প্রায় 10% এবং সে তুলনায় ছোট পাথুরে গ্রহ পাওয়ার সম্ভাবনা মাত্র ½%। তাই যে কয়টি পাথুরে গ্রহ পাওয়া গেছে সেখান থেকেই অনুমান করেছেন যে আসলে মহাকাশে ছোট পাথুরে গ্রহকে কম দেখা গেলেও তাদের মোট সংখ্যা বড়-গ্যাসীয় গ্রহ থেকে বহুগুন বেশি।

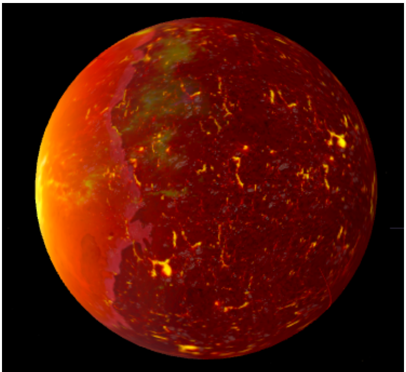
6.9 Kepler 70 b ভয়ংকর উত্তপ্ত একটি গ্রহ!

কেপলার টেলিস্কোপ দিয়ে যে অসংখ্য এক্সোপ্ল্যানেট চিহ্নিত করা হয়েছে, তার বেশিরভাগের নাম শুরু হয়েছে Kepler শব্দটি দিয়ে—যদিও আমরা বলেছিলাম যে এক্সোপ্ল্যানেটের নাম শুরু হবে সেটি যে নক্ষত্রটির গ্রহ তার নাম দিয়ে। এর কারণ, আসলে আমাদের গ্যালাক্সিতে এত অসংখ্য নক্ষত্র যে সেগুলোর বেশিরভাগেরই কোনো নাম দেওয়া হয়নি। তাই কেপলার টেলিস্কোপ দিয়ে যে সকল নক্ষত্র খুঁজে বের করা হয়েছে, সেগুলোর শুরুতে কেপলার শব্দটি ব্যবহার করে ক্যাটালগে নক্ষত্রটির ক্রমিক সংখ্যাটি দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই Kepler 186 f এক্সোপ্ল্যানেটটি হচ্ছে Kepler টেলিস্কোপে পাওয়া নক্ষত্রের তালিকাতে 186 ক্রমিক নম্বর নক্ষত্রের 5 নম্বরে পাওয়া গ্রহ। ধারণা করা হয়, এই গ্রহটি মানুষের বসবাসের উপযোগী একটি গ্রহ (ছবি 10.4)। উল্লেখ করার মতো আরেকটি গ্রহ হচ্ছে, Kepler 70 b।

Kepler 186f যেরকম মানুষের জন্য স্বর্গোদ্যান, ঠিক সেরকম Kepler 70 b এক্সোপ্ল্যানেটটি তার উল্টো, এটি হচ্ছে একটি নরক (ছবি 6.9)! গ্রহটির তাপমাত্রা এত বেশি যে সেখানে পাথর লোহা পর্যন্ত গলে গিয়ে টগ বগ করে ফুটতে থাকে। Kepler বা এরকম মহাকাশের টেলিস্কোপগুলোতে সাধারণত পূর্ণাঙ্গ ল্যাবরেটরি থাকে না, সেটি আলোর তীব্রতার পরিবর্তন মেপে নক্ষত্রগুলোতে এক্সোপ্ল্যানেট আছে কিনা ট্রানজিট পদ্ধতিতে সেটি বের করে দেয়। কিন্তু সেই গ্রহে বায়ুমণ্ডল আছে কিনা কিংবা বায়ুমণ্ডলে কি কি গ্যাস আছে, তার রাসায়নিক গঠন কী, এই তথ্য বের করতে পারে না। সেগুলো Hubble বা JWST (James Webb Space Telescope) টেলিস্কোপে কিংবা পৃথিবীর মানমন্দিরে করতে হয়।

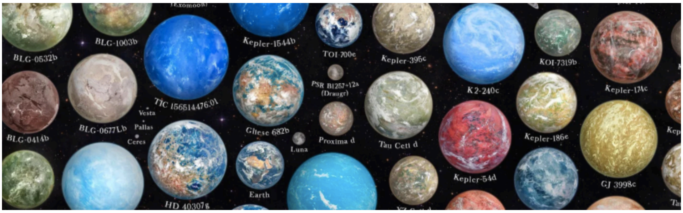

7: মাইক্রোলেন্সিং পদ্ধতি

এবারে আমরা এক্সোপ্ল্যানেট বের করার যে পদ্ধতিটির কথা বলব, এর থেকে বিচিত্র কোনো পদ্ধতি হতে পারে না। এই পদ্ধতিটির জন্য বিজ্ঞানীরা আলবার্ট আইনস্টাইনের কাছে কৃতজ্ঞ।

আমরা সাধারণভাবে জানি মহাকর্ষ বল বলতে বোঝায় একটি ভর অন্য ভরকে আকর্ষণ করা। নিউটনের মহাকর্ষ বলের সূত্র দিয়ে আমরা শুধু একটা পাথর ছুড়ে দেওয়ার গতি বের করতে পারি না, সৌরজগতের গ্রহগুলোর গতি পর্যন্ত যথেষ্ট সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। আইনস্টাইন তার জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটিতে মহাকর্ষ বলকে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই থিওরিতে একটি

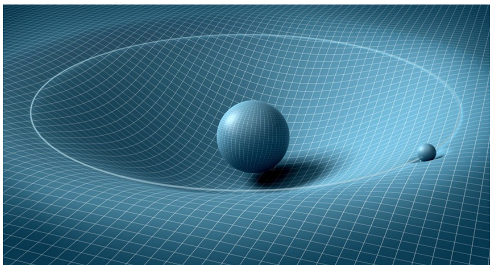

7.1 রবারের পর্দার উপর ভর।

ভর অন্য ভরকে আকর্ষণ করে, সেভাবে না দেখে তিনি দেখালেন কোনো জায়গায় একটি ভর থাকলে ভরটি তার আশেপাশের জায়গায়টিকে বাঁকা করে ফেলে। পাতলা রবারের একটি পর্দার উপর একটি পাথর রাখলে পর্দাটি

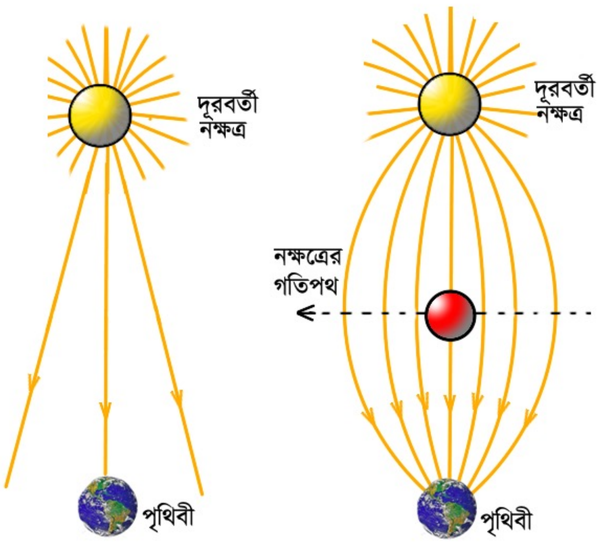

7.2 দূরবর্তী একটি নক্ষত্র ও পৃথিবীর মাঝখানে যদি একটি নক্ষত্র এসে পড়ে তাহলে দূরবর্তী নক্ষত্রের আলোর তীব্রতা বহুগুণ বেড়ে যায়।

যেভাবে বাঁকা হয়ে নিচে ঝুলে যায় (ছবি 7.1), অনেকটা সেরকম, তবে রবারের পর্দা দ্বিমাত্রিক, জায়গা বা স্থান (space) ত্রিমাত্রিক! সত্যি সত্যি একটি সূর্যগ্রহণের সময় এভাবে নক্ষত্রের আলো বেঁকে যেতে দেখার পর আইনস্টাইন রাতারাতি বিজ্ঞানের জগতের একজন সুপারস্টার হয়ে গিয়েছিলেন! আমরা

আলোচনাটি আরও বিস্তৃত না করে কীভাবে এই পদ্ধতিটি এক্সোপ্ল্যানেট খুঁজে বের করে সেই আলোচনায় চলে যাই।

7.2 ছবিতে বাম দিকে পৃথিবী থেকে কীভাবে নক্ষত্রের আলো দেখা যায় সেটি দেখানো হয়েছে। মোট আলোর খুব ছোট একটা অংশ আমরা পৃথিবী থেকে দেখতে পাই। ডান দিকের ছবিতে দেখানো হয়েছে, যদি ঘটনাক্রমে আরেকটি নক্ষত্র (কিংবা কোন ধরণের ভর) মাঝখানে চলে আসে, তখন কী হবে। যেহেতু সেই নক্ষটির ভরের কারণে তার আশেপাশের জায়গাটুকু বাঁকা হয়ে যাবে, তখন পিছনের নক্ষত্রের অনেক বেশি অংশের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাবে। কাজেই কোনো বিজ্ঞানী যদি দূরের উৎস নক্ষত্রটি থেকে আসা সেই আলো পরিমাপ করেছিলেন তাহলে তিনি দেখবেন যে আলোর পরিমাণ শত শত গুণ বেড়ে গেছে। মাঝখানে নক্ষত্রটি যদি একদিক থেকে এসে

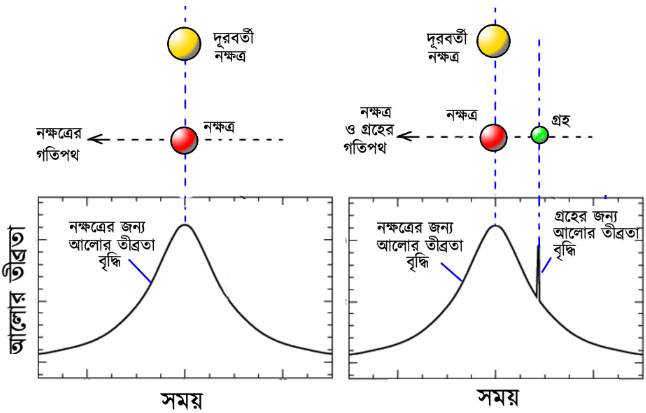

7.3 (বামে) নক্ষত্র যাওয়ার সময় আলোর তীব্রতা বেড়ে আবার কমে আসে। (ডানে) সাথে এক্সোপ্ল্যানেট থাকলে সেটির জন্যেও ছোট আকারে আলোর তীব্রতা বেড়ে যায়।

অন্যদিকে বের হয়ে যায় তাহলে আমরা দেখব আলোটি তীব্রতা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে আবার কমে গেছে, 7.3 ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে।

তোমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে আমরা এভাবে একটি নক্ষত্রের অস্তিত্বের কথা বলতে পারছি, কিন্তু একটি এক্সোপ্ল্যানেটের অস্তিত্বের কথা কেমন করে জানব? ধরা যাক, এই নক্ষত্রকে ঘিরে একটি এক্সোপ্ল্যানেট ঘুরছে। নক্ষত্রটি বাম দিক থেকে ডান দিকে চলে যাবার পর এক্সোপ্ল্যানেটটি পিছনের উৎস নক্ষত্রের সামনে এসেছে। তখন এই গ্রহটিও তার মতো করে খানিকটা জায়গা বাঁকিয়ে ফেলবে এবং সে কারণে পিছনের নক্ষত্রের আলো খানিকটা হলেও বাঁকা হয়ে এসে আলোর তীব্রতা কিছুক্ষণের জন্য বাড়িয়ে তুলবে। নক্ষত্রের মতো বেশি

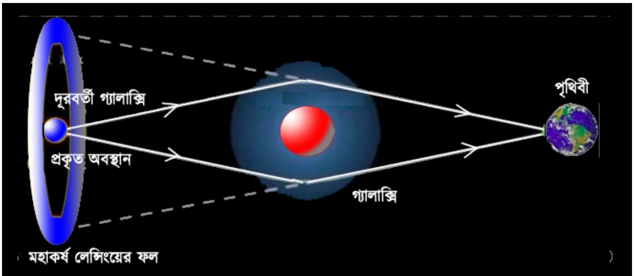

7.4 গ্যালাক্টিক লেন্সিং প্রক্রিয়া। নিকটবর্তী গ্যালাক্সি ঘিরে দূরবর্তী গ্যালাক্সির আলোকবৃত্ত মহাকর্ষ লেন্সিং প্রক্রিয়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

না হলেও তার পরিমাণ যথেষ্ট বেশি এবং সেটি বেশ স্পষ্টভাবে সেটি দেখা যায়। এই প্রক্রিয়াটির নাম মহাকর্ষ মাইক্রোলেন্সিং। কনভেক্স লেন্সে যেভাবে আলোকে বাঁকিয়ে কেন্দ্রীভূত করা হয় এই পদ্ধতিটি হুবহু একই ব্যাপার ঘটে থাকে। আলোর বেলায় যেটি ছিল ম্যাগনিফাইং লেন্স এখানে সেটি হচ্ছে গ্রহের ভর।

মহাকর্ষ লেনসিং (lensing) না বলে মহাকর্ষ মাইক্রোলেন্সিং (microlensing) বলা হয়েছে তার কারণ প্রক্রিয়াটি হয় খুবই ক্ষুদ্র পরিসরে। আমরা সবসময়েই একটি আলোকবিন্দু দেখি এবং তার তীব্রতা বাড়তে কমতে দেখি এর বেশি কিছু দেখি না। কিন্তু যদি পুরো খুঁটিনাটি দেখতে পেতাম তাহলে বিষয়টি হতো অনেক চমকপ্রদ! সেই প্রক্রিয়াটি সত্যি সত্যি দেখা যায়, যখন একটি ছোট গ্রহ নয়—বিশাল একটি গ্যালাক্সি লেন্স হিসেবে কাজ করে, পিছনের অন্য কোনো নক্ষত্র, কোয়াজার বা গ্যালাক্সির আলোকে কেন্দ্রীভূত করে। 7.4 ছবিতে দেখানো উপায়ে আমরা যদি আমাদের নক্ষত্রটির একটি ছবি তুলতাম তাহলে সেটি কেমন দেখা যেত?

আলোক রশ্মি যদি বাঁকা হয় যদি আমাদের চোখে পৌঁছায় আমরা কিন্তু সেটি জানব না, আলোক রশ্মি যেদিক থেকে এসেছে আমাদের মনে হবে আলোর উৎসটি সেখানেই আছে। সেজন্য যদি একেবারে শতভাগ নক্ষত্রের সাথে এক সরল রেখায় চলে আসে হয় তাহলে আমরা পিছনে নক্ষত্রটিকে আর একটি বিন্দু থেকে আসছে না দেখে দেখব আলোটি বৃত্তাকার একটি আলোর উৎস থেকে আসছে (ছবি 7.4 এবং ছবি 7.5)!

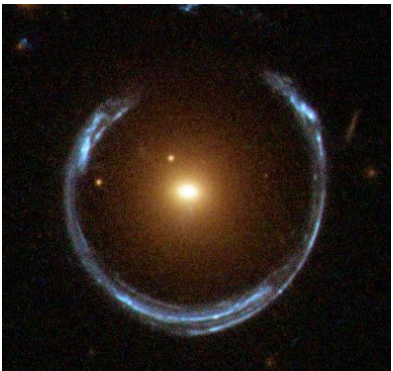
7.5 গ্যালাক্টিক লেন্সিং এর প্রকৃত ছবি. সামনের গ্যালাক্সিকে ঘিরে দূরবর্তী গ্যালাক্সির আলোকে বৃত্তাকারে দেখা যাচ্ছে।

এই পদ্ধতিটি অসাধারণ পদ্ধতি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু

পদ্ধতিটির দুটি বড় সীমাবদ্ধতা আছে। প্রথমটি হচ্ছে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে একটি নক্ষত্র বেছে নিয়ে তার মাইক্রোলেন্সিং দেখতে পারি না। সেই নক্ষত্রের জন্য ঠিক তার সরাসরি পিছনে আরেকটি উৎস নক্ষত্র থাকবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, বিজ্ঞান সবসময়ই একটি পর্যবেক্ষণ বারবার করে নিশ্চিত হতে চায়, কিন্তু এই পদ্ধতিকে একবার একটি গ্রহের মাইক্রোলেন্সিং দেখার পর সেটি দ্বিতীয়বার দেখার কোনো সুযোগ নেই! পুরোটা অনেকটা ভাগ্যের ব্যাপার। ঘটনাক্রমে আমরা যদি এক্সোপ্ল্যানেটসহ একটি নক্ষত্রকে পিছনের আরেকটি উৎস নক্ষত্রের সামনে পেয়ে যাই, তাহলে আমরা এক্সোপ্ল্যানেটের অস্তিত্ব, নক্ষত্রের তুলনায় তার ভর এবং নক্ষত্র থেকে সেটি কত দূরে, সেই তথ্য পেয়ে যাই। শুধু তাই নয় গ্রহটির ভর তুলনামূলকভাবে কম হলেও সেটি মাইক্রোলেন্সিং পদ্ধতিতে বের হয়ে আসে।

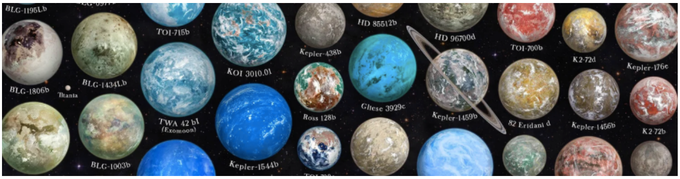

৪: সরাসরি ছবি তোলা পদ্ধতি

আমরা এখন পর্যন্ত এক্সোপ্ল্যানেট খুঁজে বের করার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির কথা বলেছি এবং তোমরা দেখেছো যে এই তিনটি পদ্ধতি দিয়ে আমরা যে শুধু এক্সোপ্ল্যানেটের অস্তিত্বের কথা জানতে পারি, তা নয়, তাদের সম্পর্কে নানা রকম তথ্য পর্যন্ত জেনে যাই! শিল্পীরা সেই তথ্যের ভিত্তিতে এক্সোপ্ল্যানেটগুলোর সম্ভাব্য ছবি পর্যন্ত এঁকে ফেলেন! এখন পর্যন্ত এই বইয়ে তোমরা যতগুলো এক্সোপ্ল্যানেটের ছবি দেখেছ সবগুলো শিল্পীদের আঁকা ছবি, সত্যিকার ছবি নয়! তারপরও এটিকে অস্বীকার করতে পারবে না যে সরাসরি একটি এক্সোপ্ল্যানেটকে দেখা এবং সেই এক্সোপ্ল্যানেটের ছবি তোলার থেকে বেশি চমকপ্রদ ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। তুলনা করার জন্য এরকম বলা

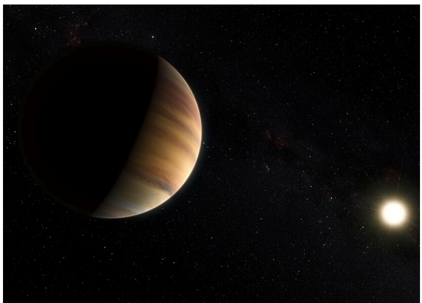

8.1 শিল্পীর আঁকা এক্সপ্ল্যানেটের ছবি, দূরে এক্সোপ্ল্যানেটের নক্ষত্রটিকে দেখা যাচ্ছে।

যায়, সুন্দরবনে বেড়াতে গিয়ে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পায়ের ছাপ দেখা আর সত্যিকার রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখার মতো ব্যাপার।

সরাসরি এক্সোপ্ল্যানেট দেখার ব্যাপারটি বহুদিন বিজ্ঞানীদের স্বপ্নের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। সঙ্গত কারণেই বিষয়টি প্রায় অসম্ভব একটি স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু না। তার কারণ গ্রহের নিজের কোনো আলো নেই তার নক্ষত্রের আলো দিয়ে দৃশ্যমান হতে হয়, নক্ষত্রের তীব্র আলো এক্সোপ্ল্যানেটের অতি নিষ্প্রভ আলো থেকে প্রায় এক বিলিয়ন গুণ বেশি, সেই নক্ষত্র পৃথিবী থেকে বহু আলোকবর্ষে দূরে এবং এ দুটোকে আলাদা করার মতো টেলিস্কোপ পর্যন্ত পাওয়া কঠিন। বিষয়টি 1000 km দূর থেকে একটি সার্চ লাইটকে ঘিরে ঘুরতে থাকা একটি ছোট পোকাকে দেখার মতোই কঠিন।

তারপরও বিজ্ঞানীরা হাল ছেড়ে দেননি। দিনের বেলায় আমরা আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র দেখি না। আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি পরীক্ষা করার জন্য সূর্যের কাছাকাছি কয়েকটি নক্ষত্র দেখার প্রয়োজন ছিল। শেষ পর্যন্ত সেই নক্ষত্রটি দেখা সম্ভব হয়েছিল পূর্ণ সূর্য গ্রহণের সময়। তখন সূর্যের পুরো আলো চাঁদ দিয়ে ঢাকা পড়ার পর দিনের বেলাতেই সূর্যের পাশে নক্ষত্র দেখা সম্ভব হয়েছিল। এছাড়াও

8.2 সূর্যগ্রহণের সময় তোলা ছবি দিয়ে জেনারেল রিলেটিভিটির প্রমাণ।

সূর্যের বায়ুমণ্ডল বা করোনা আমরা সাধারণত দেখতে পাই না, শুধুমাত্র সূর্যগ্রহণের সময় সেটি স্পষ্ট দেখা যায়।

কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সূর্যগ্রহণ হয় খুব কম, গড়ে এক দশকে হয়তো একবার। কিন্তু করোনাকে বিশ্লেষণ করার জন্য সূর্যগ্রহণ ছাড়াই সুর্যের করোনাকে দেখার জন্য বিজ্ঞানীরা একটি পদ্ধতি বের করেছিলেন, সেটির নাম করোনাগ্রাফ। মূল ধারণাটি খুব সহজ, সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদ মহাকাশের সূর্যকে ঢেকে ফেলে। করোনাগ্রাফ টেলিস্কোপের ভেতর আলোর ফোকাল সমতলে সূর্যকে ঢেকে ফেলে। এক্সোপ্ল্যানেটকে দেখার জন্য এই পদ্ধতিতে বিশেষ করোনাগ্রাফ তৈরি করা হলো। যেটি দিয়ে এক্সোপ্ল্যানেটের মূল নক্ষত্রটির আলো ঢেকে ফেলা যায়। আশা করা হল তখন বিজ্ঞানীরা টেলিস্কোপে শুধু এক্সোপ্ল্যানেটের নিষ্প্রভ আলো দেখবেন।

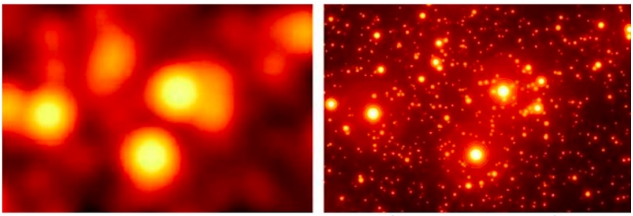

8.3 Adaptic Optics ব্যবহার করে ঝাপসা আলোকপিণ্ডকে সূক্ষ্ম আলোকবিন্দুতে রূপান্তরিত করা যায়!

নক্ষত্রের আলোকে সরিয়ে দিয়ে শুধু এক্সোপ্ল্যানেটের আলোর দিকে তাকিয়েই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়নি! মহাকাশে অতি সূক্ষ্ম আলো দেখার উপযোগী টেলিস্কোপ পাঠানোর আগে পৃথিবীর টেলিস্কোপ দিয়েই সব কিছু দেখতে হত। কিন্তু পৃথিবী থেকে দূর আকাশের নক্ষত্র দেখার সমস্যাটির কথা আমরা সবাই জানি। আমরা যারাই আকাশের দিকে তাকিয়েছি, তারাই জানি নক্ষত্রের আলো

কী চমৎকারভাবে মিটিমিটি করে কিংবা ঝিকিমিকি করে জ্বলজ্বল করে। এটি আমাদের কাছে যত অপূর্বই মনে হোক, বিজ্ঞানীদের কাছে একটি ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন! তার কারণ, মিটিমিটি করার অর্থ বহুদূর থেকে নক্ষত্রের আলোক রশ্মিটি পৃথিবীতে আসার পথে এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌঁছানোর সময় বাতাসের তাপের তারতম্য আর ঘনত্বের পার্থক্য এরকম অসংখ্য কারণে ক্রমাগত নাড়াচাড়া করছে। কাজেই যে আলোকবিন্দুটিকে একটি স্থির আলোকবিন্দু হওয়ার কথা সেটি অস্পষ্ট, বিস্তৃত, ক্রমাগত নড়তে থাকা একটি আলোকপিণ্ড হয়ে যায়! কাজেই সেখানে সূক্ষ্ম একটি ছবি পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

বিজ্ঞানীরা কখনো হাল ছাড়েন না, এখানেও হাল ছাড়লেন না। নক্ষত্রের মিটিমিটি কিংবা ঝিকিমিকি বন্ধ করার জন্য, টেলিস্কোপে দেখার সম্পূর্ণ নতুন একটা পদ্ধতি বের করে ফেললেন, সেটার নাম অ্যাডাপটিভ অপটিক্স (Adaptive Optics)। এই পদ্ধতিতে বিজ্ঞানীরা টেলিস্কোপে কাছাকাছি অন্য একটি নক্ষত্রকে দেখেন, তারা জানেন এই নক্ষত্রটিকে আসলে একটি আলোকবিন্দু হিসেবে দেখার কথা ছিল, তাই সেই নক্ষত্রের আলো কীভাবে নড়ছে বা কাঁপছে সেটি দেখে টেলিস্কোপটির বিশাল আয়না এমনভাবে পরিবর্তন করতে থাকেন যেন নক্ষত্রটির আলো একটি স্থির আলোকবিন্দু হয়ে যায়। তার ফলে সেই টেলিস্কোপে অন্য যেসব আলো আসছে সেগুলোর ঝিকিমিকি বা কম্পনও দূর হয়ে যায়। পদ্ধতিটি কত কার্যকর সেটি ৪.3 ছবিতে দেখানো হয়েছে।

তোমরা হয়তো ভাবছো সরাসরি এক্সোপ্ল্যানেট দেখার জন্য সম্ভাব্য যেসব সমস্যা রয়েছে তার সব সমাধান হয়ে গেছে! আসলে এখনো অনেক বড় বড় সমস্যা রয়ে গেছে। যেমন একটি সমস্যা হচ্ছে আলো যেহেতু তরঙ্গ, তাই তরঙ্গের ধর্ম অনুযায়ী সেটি যখনই একটি বাধার সামনে পড়ে সেটি চারপাশে

ছড়িয়ে পড়ে (Diffraction)। কাজেই দূর নক্ষত্রের আলো করোনাগ্রাফ দিয়ে আটকে দেওয়ার পরও বাধা পাওয়া আলো টেলিস্কোপের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে। তাই সেখানে অপ্রয়োজনীয় আলোর ছড়াছড়ির মাঝে সত্যিকার এক্সোপ্ল্যানেটের আলো হারিয়ে যায়। এই সমস্যার সামাধান করার জন্য টেলিস্কোপটিকে নক্ষত্রের সাপেক্ষে স্থির রেখে তার অক্ষে ঘোরানো হয়। তখন এক্সোপ্ল্যানেটের আলো স্থির থাকলেও, টেলিস্কোপের গঠনের কারণে যে আলোর দূষণ হয়েছে সেগুলো ঘুরতে থাকে। তার গড় নিলে সেটি কমে যায় এবং তখন এটিকে আলাদাও করা যায়।

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, সরাসরি এক্সোপ্ল্যানেটকে দেখার সমস্যা আসলে শেষ হবার নয় এবং বিজ্ঞানীরা কী চমৎকারভাবে একটার পর আরেকটা সমাধান করেছেন, সেই আলোচনা কখনও শেষ হওয়ার নয়। এটিও নিশ্চয় অনুমান করেছ যে এখানে সমাধানগুলো সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে প্রকৃত সমাধানগুলো আরও অনেক জটিল। কিন্তু এ আলোচনা আর লম্বা না করে আমরা সরাসরি এক্সোপ্ল্যানেট দেখার মাঝে শেষ পর্যন্ত যে সাফল্য এসেছে তার কথা বলি।

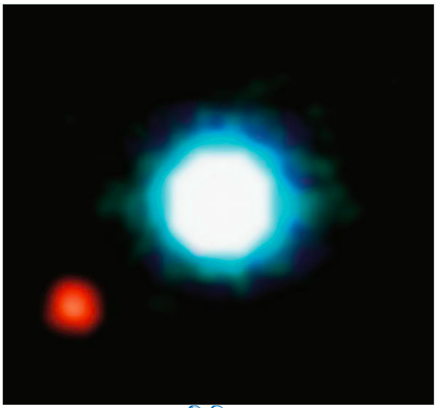

8.4 তুলনামূলকভাবে একটি নিষ্প্রভ নক্ষত্রের পাশে তোলা 2M1207 b এক্সোপ্ল্যানেটের প্রথম সরাসরি ছবি।

বিজ্ঞানীরা প্রথম সরাসরি এক্সোপ্ল্যানেট দেখেছেন 2004

সালে। সেই এক্সোপ্ল্যানেটের নাম 2M 1207 b, বিজ্ঞানীরা যুক্তিসঙ্গত কারণে সূর্যের মতো কিংবা তীব্র আলো আছে এরকম একটি নক্ষত্র ঘিরে ঘূর্ণায়মান এক্সোপ্ল্যানেট দেখার চেষ্টা না করে এমন একটি নক্ষত্র বেছে নিয়েছেন যার আলো খুবই নিষ্প্রভ। সত্যিকার অর্থে 2M 1207 নক্ষত্রটি আসলে একটি ব্যর্থ নক্ষত্র, অর্থাৎ যথেষ্ট ভর না থাকায় সত্যিকার অর্থে এটি পুরোপুরি নক্ষত্রের মত আলো ছড়াতে পারেনি। সে কারণে তার এক্সোপ্ল্যানেট দেখা সম্ভব হয়েছিল।

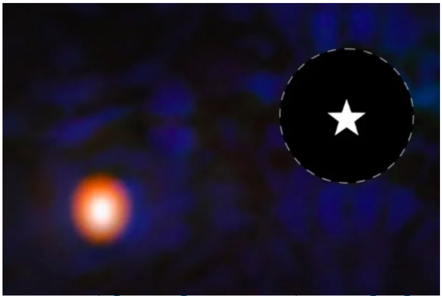

8.5 JWST টেলিস্কোপ দিয়ে এক্সপ্ল্যানেটের সরাসরি ছবি তোলার উদাহরণ। ডান দিকে নক্ষত্রটিকে করোনাগ্রাফ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।

1990 সালে যখন Hubble টেলিস্কোপ পাঠানো হয়েছিল তখন বিজ্ঞানীরা এক্সোপ্ল্যানেট সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতেন না, তাই সেটি এক্সোপ্ল্যানেট দেখার উপযোগী করে তৈরি করা হয়নি। 2021 সালে যখন JWST পাঠানো হয়েছে তখন এক্সোপ্ল্যানেট সম্পূর্ণ নতুন একটি অধ্যায় তৈরি করে ফেলেছে। তাই, JWST টেলিস্কোপটি একাধিক করোনাগ্রাফসহ এক্সোপ্ল্যানেটের আলো বিশ্লেষণ করার জন্য পূর্ণাঙ্গ ল্যাবরেটরি হিসেবে পাঠানো হয়েছে। সেই টেলিস্কোপ ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা সরাসরি এক্সোপ্ল্যানেটের যেসব ছবি তুলেছেন, সেরকম আরো একটি ছবি দেওয়া হলো (ছবি 8.5)।

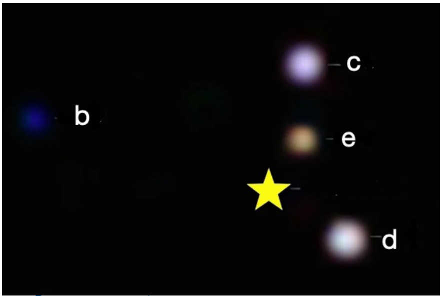

8.6 ভিনজগতের ‘সৌরজগৎ’, HR8799 নক্ষত্রকে (করোনাগ্রাফ দিয়ে ঢাকা) ঘিরে চারটি এক্সোপ্ল্যানেট।

তবে বিজ্ঞানীদের পরের মাইলফলকটি আসলেই অসাধারণ। সেটি হয়েছিল 2008 সালে, যখন বিজ্ঞানীরা প্রথমবার একটি নক্ষত্রকে ঘিরে শুধু একটি এক্সোপ্ল্যানেটকে খুঁজে পাননি, তারা পুরো একটি ‘সৌরজগৎ’ খুঁজে পেয়েছেন (ছবি 8.6)। যেখানে HR 8799 নামে ভিন জগতের সূর্যকে ঘিরে ঠিক আমাদের সৌরজগতের মতো চারটি গ্রহ ঘুরছ।

বিজ্ঞানীরা এখন নিশ্চিত ভাবে জানেন যে আমাদের সৌরজগৎটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র সৌরজগৎ নয়, এরকম আরো অসংখ্য ‘সৌরজগৎ’ আছে।

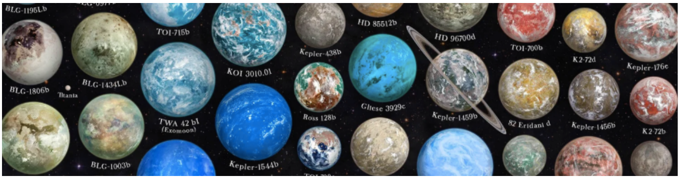

9: এক্সোপ্ল্যানেটের বৈচিত্র্যময় জগৎ

আমরা আগের চারটি অধ্যায়ে এক্সোপ্ল্যানেটকে খুঁজে বের করার চারটি ভিন্ন পদ্ধতির কথা আলোচনা করেছি। এই পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা একটি-দুটি নয় আক্ষরিক অর্থে হাজার হাজার এক্সোপ্ল্যানেট খুঁজে বের করেছেন এবং আরো এক্সোপ্ল্যানেট বের হওয়ার পথে রয়েছে। আমাদের সৌরজগতের গ্রহগুলো দেখে, সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা গ্রহ কীরকম হয়, সেগুলো কীভাবে তৈরি হয়, তাদের বৈশিষ্ট্য কী হতে পারে এরকম বেশ কিছু ধারণা করেছিলেন। অসংখ্য এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কার করে বিজ্ঞানীরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছেন যে, তাদের ধারণার বাইরে এক্সোপ্ল্যানেটের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জগৎ রয়েছে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝেই মনে হয়, ভিন জগতের 'সৌরজগৎ' এবং সেগুলোর গ্রহগুলো বেশিরভাগ সময়েই আমাদের সৌরজগৎ এবং আমাদের গ্রহগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কে জানে, হয়তো সেগুলোই স্বাভাবিক এবং প্রচলিত সৌরজগৎ, আমরাই অন্যরকম!

তোমাদের বলা হয়েছে যে 1995 সালে সবার প্রথম যে এক্সোপ্ল্যানেটটি রেডিয়াল ভেলোসিটি পদ্ধতিতে আবিষ্কার করা হয়েছিল সেই গ্রহটির আকার বৃহস্পতি গ্রহের কাছাকাছি ছিল। কিন্তু বৃহস্পতি গ্রহ যেরকম শীতল একটি

গ্যাসীয় গ্রহ, 5 AU দূরত্বে থেকে বারো বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসে, 51 Pegasi b গ্রহটি মোটেও সেরকম নয়। সেই এক্সোপ্ল্যানেটটি ছিল প্রায় 1000 ডিগ্রি C তাপমাত্রার গ্রহ যে তাপমাত্রায় পাথর পর্যন্ত গলে যায়! এক্সোপ্ল্যানেটটি 51 Pegasi b নক্ষত্রের এতো কাছে ছিল যে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে তার সময় লাগে মাত্র চারদিন। বিজ্ঞানীরা সেই গ্রহটির নাম দিয়েছিলেন উত্তপ্ত বৃহস্পতি বা হট জুপিটার!

সবাই ভেবেছিল প্রথম আবিষ্কৃত গ্রহ হিসেবে ঘটনাক্রমে এরকম বিচিত্র একটি এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কৃত হয়ে গেছে! অন্য গ্রহগুলো নিশ্চয়ই আমাদের পরিচিত শীতল বৃহস্পতির মতোই হবে। কিন্তু যখন কেপলার টেলিস্কোপ দিয়ে কয়েক হাজার এক্সোপ্ল্যানেট খুঁজে বের করা হলো, তখন তারা সবিস্ময়ে দেখলেন ছায়াপথ গ্যালাক্সিতে আমাদের সৌরজগতের শীতল বৃহস্পতির মতো গ্রহ আছে সত্যি, কিন্তু উত্তপ্ত বৃহস্পতির সংখ্যা মোটেও কম নয়। অসংখ্য উত্তপ্ত বৃহস্পতির মতো গ্রহ রয়েছে! আমাদের সৌরজগতের বৃহস্পতি গ্রহটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা বের করেছিলেন, এটি কীভাবে তৈরি হয়েছিল এবং এরকম অতিকায় গ্যাসীয় গ্রহ তৈরি হতে হলে সেটিকে কেন তার নক্ষত্র থেকে যথেষ্ট দূরে থাকতে হয়, সেটিও তারা ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে নক্ষত্রের খুব কাছে থেকে একটি ভিন্ন ধরনের

9.1 শিল্পীর দৃষ্টিতে পিছনে একটি নক্ষত্রের সামনে একটি উত্তপ্ত বৃহস্পতি।

‘উত্তপ্ত বৃহস্পতি’ এক্সোপ্ল্যানেটকে প্রদক্ষিণ করতে দেখে বিজ্ঞানীদের নতুন করে কাগজ কলম নিয়ে বসতে হয়েছিল।

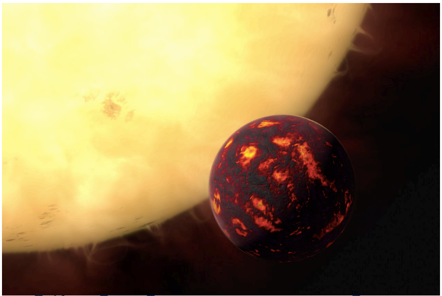

9.2 শিল্পীর দৃষ্টিতে পিছনে নক্ষত্রের সামনে একটি পাথুরে অতিকায় পৃথিবী বা সুপার আর্থ।

কীভাবে নক্ষত্রের এত কাছে এরকম একটি গ্রহ তৈরি হতে পারে? নক্ষত্রের এত কাছে থাকলে এতদিনে সূর্যের সৌরকণার প্রবাহেই তার গ্যাসীয় আবরণ উড়ে যাওয়ার কথা ছিল। বিজ্ঞানীরা এখনো সেটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। আপাতত ধারণা করছেন এটি প্রথমে আসলে দূরেই তৈরি হয়েছিল। একবারে প্রাথমিক অবস্থায় নক্ষত্রের সাথে যখন নক্ষত্রের পরিত্যক্ত গ্যাস, ধূলিকণা ইত্যাদি মিলে নতুন গ্রহ তৈরি হয় তখন সেগুলো থাকে পুরোপুরি অস্থিতিশীল। তখন গ্রহগুলোর একটার সাথে আরেকটা ধাক্কা খেয়ে কেরমের গুটির মতো ছুটে নক্ষত্রের কাছাকাছি হাজির হতে পারে।

উত্তপ্ত বৃহস্পতি নক্ষত্রের এত কাছে থাকার জন্য এটি তার নক্ষত্রের সাথে ‘টাইডাল লক’ (পরিশিষ্ট 12.4) হয়ে থাকে, অর্থাৎ নিজ অক্ষে ঘূর্ণন বন্ধ হয়ে একটি পৃষ্ঠ সবসময় নক্ষত্রের দিকে মুখ করে থাকে। পৃথিবী এভাবে চাঁদকে টাইডাল লক করে আটকে রেখেছে, যে জন্য আমরা সব সময় চাঁদের একটি পৃষ্ঠ দেখি, অন্যটি দেখি না!

এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কার হওয়ার পর দ্বিতীয় যে ধরনের গ্রহ বিজ্ঞানীদের অবাক করেছিল, সেটি হচ্ছে পাথুরে গ্রহ কিন্তু পৃথিবী থেকে অনেক বড়। তার নাম দেওয়া হয়েছিল অতিকায় পৃথিবী বা সুপার-আর্থ (Super Earth)। আমাদের সৌরজগতে সবচাইতে বড় পাথরের গ্রহ হচ্ছে পৃথিবী এবং বিজ্ঞানীরা যুক্তিসঙ্গত কারণেই ধরে নিয়েছিলেন এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত অসংখ্য এক্সোপ্ল্যানেট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বের করেছেন যে, আসলেই গ্যালাক্সিতে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় অতিকায় পৃথিবী কিংবা সুপার-আর্থ। সূর্যের মতো প্রতি তিনটি নক্ষত্রের মাঝে আনুমানিক একটি নক্ষত্রে অতিকায় পৃথিবীর মতো একটি গ্রহ থাকে। এই গ্রহগুলোর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ঘনত্ব নির্দিষ্ট নয়, কম কিংবা বেশি হতে পারে। তাই এর গঠন কেমন হবে সেটিও একটি রহস্য। কোনো সুপার আর্থ হয়তো ঠিক পৃথিবীর মতো। কোনো কোনো সুপার আর্থ হয়তো পাথুরে, আভ্যন্তরীণ কোরের বাইরে বিশাল মহাসমুদ্রে ঢাকা, আবার কোনটি হয়তো ভেতরে পাথুরে কোরের বাইরে গ্যাসীয় আবরণ। সেগুলো বিশ্লেষণ করার জন্য JWST তার আলো বিশ্লেষণ করছে। তোমরা ট্রানজিট পদ্ধতি অধ্যায়ে ইতিমধ্যে Trappist 1 নক্ষত্র এবং সেটির 7 টি গ্রহের কথা জেনেছ, Kepler 90 নামে নক্ষত্রকে ঘিরে 7 টি নয়, আরো বেশি, 8 টি গ্রহ পাওয়া গেছে (ছবি 9.3)।

9.3 ভিন জগতের সৌরজগতে Kepler 90 এবং তার আটটি এক্সোপ্ল্যানেট।

তবে বৈচিত্র্যময় গ্রহের নাম বলতে হলে অবশ্যই Kepler 16 b গ্রহের নাম বলতে হবে। কারণ এটি একটি নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ না করে দুটি নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে (ছবি 9.4)। এটি একটি শীতল গ্যাসীয় দানব গ্রহ এবং এই গ্রহের আকাশে একটি নয় দুটি সূর্য উদয় হয় এবং অস্ত যায়। এই বিচিত্র গ্রহটি দেখে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন যে দুটি নক্ষত্রকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করেও একটি স্থিতিশীল কক্ষপথ হওয়া সম্ভব।

আরও এক ধরনের গ্রহ রয়েছে যেগুলোকে ফাঁপা গ্রহ বলা যায়। এগুলোর ভর হয়তো পৃথিবী থেকে মাত্র কয়েকগুণ বেশি। কিন্তু যার আকার হয়তো বৃহস্পতির সমান। এই গ্রহগুলোর ঘনত্ব শোলা বা স্টাইরোফর্মের মতো। Kepler 51 এর গ্রহগুলোকে এরকম ধারণা করা হয়। একটি গ্রহের ঘনত্ব এত কম কেমন করে হতে পারে সেটি বিজ্ঞানীদের কাছে একটি রহস্য।

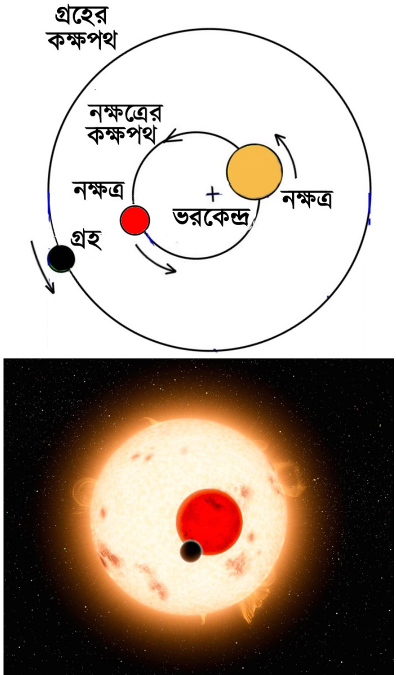

9.4 (উপরে) দুই নক্ষত্রের ভরকেন্দ্রকে ঘিরে Kepler 16 b এক্সোপ্ল্যানেটটি ঘুরছে (নিচে) নক্ষত্রদুটি এবং গ্রহটি যখন এক সরল রেখায়।

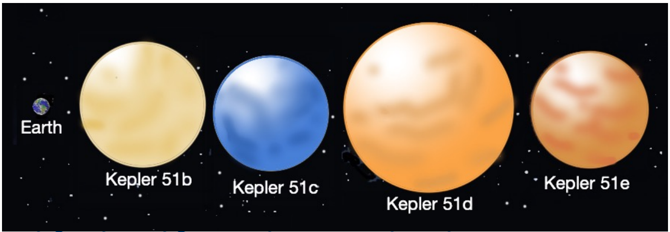

9.5 শিল্পীর দৃষ্টিতে পৃথিবীর কাছাকাছি ভরের নক্ষত্র কিন্তু অতিকায় আয়তনের ফাঁপা গ্রহ।

এতক্ষণ তোমাদের যে নানা ধরনের এক্সোপ্ল্যানেটের কথা বলা হয়েছে সেগুলো সবসময় একটি নক্ষত্রের মহাকর্ষ বলে আটকা পড়ে থেকে সেটিকে প্রদক্ষিণ করে। এমনকি তাদের নামকরণও করা হয় নক্ষত্রের নামের শেষে b, c, d, ... এরকম অক্ষর যুক্ত করে। কিন্তু এমনটি কি হওয়া সম্ভব যে একটি গ্রহ কোনো নক্ষত্রের মহাকর্ষ বলে আটকা পড়েনি? এটি মুক্ত স্বাধীনভাবে, মহাকাশের মহাশূন্যে একাকী নিসঙ্গ যাযাবরের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে? তোমাদের বিশ্বাস করতে নিশ্চয়ই কষ্ট হবে যে, আসলেই কিন্তু আমাদের গ্যালাক্সিতে এরকম গ্রহ সত্যিই রয়েছে। এই গ্রহগুলোকে বলা হয় খ্যাপা গ্রহ (Rogue Planet)।

মাইক্রোলেন্সিং পদ্ধতিতে একটি চমকপ্রদ ঘটনা হিসেবে যে বিষয়টি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, সেটি হচ্ছে এই পদ্ধতিতে, একেবারে কোনো নক্ষত্রবিহীন একক এক্সোপ্ল্যানেট বা খ্যাপা গ্রহ খুঁজে পাওয়া গেছে। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানীরা কখনো চিন্তা করেননি যে, একটি গ্রহ কোনো নক্ষত্রের সাথে আবদ্ধ না হয়ে মহাকাশের বিশাল শূন্যতায় নিঃসঙ্গ যাযাবর মানুষের মতো একা একা ঘুরে বেড়াতে পারে। এরকম একটি নিঃসঙ্গ যাযাবর খ্যাপা গ্রহ হচ্ছে OGLE-2016-BLG-1928। এই গ্রহের মাইক্রোলেন্সিং মাত্র 42 মিনিট স্থায়ী একটি ঘটনা ছিল।

যেহেতু মাইক্রোলেন্সিং প্রক্রিয়াটি অনেকটাই ভাগ্যের ব্যাপার, কাজেই এই ঘটনাটি দেখার জন্য বিজ্ঞানীরা একটি কাজ করেন, তারা বিরামহীনভাবে দিন রাত অনবরত একটার পর আরেকটা নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন আর যদি ঘটনাক্রমে মাইক্রোলেন্সিংয়ের একটুখানি নিশানা পেয়ে যান সাথে সাথে সেটি অন্যান্য মানমন্দিরকে জানিয়ে দেন। যেহেতু মাইক্রোলেন্সিং ঘটে খুব কম সময়ের জন্য তাই, সবাই একসাথে সেই মাইক্রোলেনসিং পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে দেন। তখন দুধের সাধ ঘোলে মিটানোর মত একটি ব্যাপার ঘটে, অনেকবার একটি পর্যবেক্ষণ করার বদলে অনেকে মিলে ভিন্ন ভিন্ন ল্যাবরেটরিতে একসাথে একটি পর্যবেক্ষণ করে করা হয়!

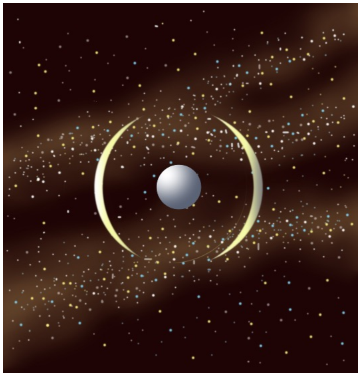

9.6 খ্যাপা গ্রহ OGLE-2016-BLG-1928 এর কাল্পনিক মাইক্রোলেন্সিং এর ছবি।

বিজ্ঞানীরা এখন ধারণা করছেন যে, গ্যালাক্সিতে এরকম পুরোপুরি মুক্ত একক গ্রহ আসলে খুব বিরল ঘটনা নয় বরং এটি পুরোপুরি সম্ভাব্য ঘটনা। তোমাদের একটু আগেই বলা হয়েছে যে যখন একটি নেবুলা থেকে প্রথম সৌরজগতের মতো একটি নক্ষত্রকে ঘিরে বেশ কয়েকটি গ্রহ তৈরি হয়, তখন প্রথম প্রথম তাদের কক্ষপথগুলো মোটেই স্থিতিশীল থাকে না। তখন একটি গ্রহের সাথে অন্য গ্রহের ধাক্কাধাক্কি এবং ঠোকাঠুকি খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। যখন বড় কোনো গ্রহের ধাক্কায় একটি গ্রহ কক্ষচ্যুত হয়ে সেই সৌরজগতের বাইরে ছিটকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা। যেহেতু সব নক্ষত্র গ্রহ সিস্টেম

শুরুতে এরকম অস্থিতিশীল প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে গিয়েছে, তাই সব সৌরজগৎ থেকেই একটি গ্রহ কক্ষচ্যুত হয়ে মহাশূন্যে ছিটকে পড়া খুবই স্বাভাবিক। ধারণা করা হয় গ্যালাক্সির আন্তঃনক্ষত্র মহাশুন্যে এরকম নিঃসঙ্গ যাযাবর গ্রহ অল্প কিছু নয়, তাদের সংখ্যা মিলিয়ন বা বিলিয়ন হতে পারে।

তবে এ কথাটি সত্যি, যেহেতু এরকম গ্রহ কোনো নক্ষত্রের সাথে যুক্ত নেই তাই সেই গ্রহটিতে কোনো আলো পড়ে না। তাই গ্রহটি পাথুরে পুরোপুরি আলোহীন অন্ধকার শীতল একটি গ্রহ। কোনো টেলিস্কোপে এটি দেখার উপায় নেই। রেডিয়াল বা ট্রানজিট পদ্ধতিতেও দেখা যাবে না। সরাসরি দেখারও উপায় নেই। এটি শুধুমাত্র মাইক্রোলেন্সিং পদ্ধতিতে দেখা সম্ভব। তবে তোমাদের আগেই বলা হয়েছে মাইক্রোলেন্সিং পদ্ধতিতে এটি দূর কোনো নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। অর্থাৎ হঠাৎ করে কোনো যাযাবর নিঃসঙ্গ গ্রহ এই নক্ষত্রের সামনে এসে মাইক্রোলেন্সিং করে কিছুক্ষণের জন্য তার আলোকে বাড়িয়ে তুলে আবার সেই গ্রহ শূণ্যতায় হারিয়ে যাবে। ঠিক এই কাজটি করার জন্য! OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) এবং MOA (Microlensing Observatory in Astrophysics) ল্যাবরেটরি তৈরি করা হয়েছে এবং সেগুলো দিনরাত মহাকাশে নিঃসঙ্গ যাযাবর গ্রহ খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং সত্যি সত্যি মাঝে মাঝেই এরকম নিঃসঙ্গ যাযাবর গ্রহ খুঁজে পাচ্ছে!

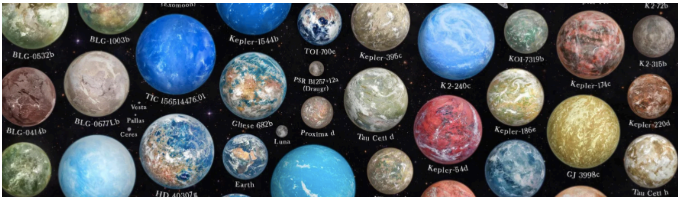

10: গোল্ডিলকস গ্রহ

মানুষের ভেতরে জানার যে আগ্রহ রয়েছে, সেটি মানুষের বেঁচে থাকার পেছনে সবচেয়ে বড় প্রেরণা। তাই তারা যখন জানতে পেরেছে যে আমাদের সৌরজগৎ এই গ্যালাক্সির একমাত্র গ্রহমণ্ডলী নয় এরকম অসংখ্য গ্রহমণ্ডলী রয়েছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা সেই ভিন জগতের গ্রহ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছে। মাত্র কয়েক দশকে সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের পরিধি অনেক বেড়ে গেছে, আমাদের অনেক কিছুই আবার নতুন করে ভাবতে হয়েছে। ভিন জগতের গ্রহ সম্পর্কে জানার এই আগ্রহের পিছনে আরও একটি কারণ আছে। বিজ্ঞানীরা অবশ্যই সেই গ্রহের গঠন সম্পর্কে জানতে চান, গ্রহমণ্ডলীর গঠন জানতে চান, কিন্তু সাথে সাথে সবসময় তাদের মনের মাঝে অন্য আরেকটি কৌতুহল কাজ করে। তারা সবসময়েই জানতে চেয়েছেন, সৌরজগতের বাইরে আরও কোথাও কি এমন কোনো গ্রহ আছে, যেখানে ঠিক মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীর বিকাশ হয়েছে? যদি থেকে থাকে তাহলে তারা কি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চায়? আমরা কি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি?

আমরা সবাই জানি পৃথিবীতেই যে প্রাণের বিকাশ হয়েছে তার জন্য এই গ্রহটিতে বেশ কিছু বিষয়ের প্রয়োজন ছিল, এর তাপমাত্রা, এখানে পানির

অস্তিত্ব, বায়ুমণ্ডল, বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন, বায়ুমণ্ডলের চাপ, আলো এই সবগুলো ঠিকভাবে দীর্ঘসময় স্থিতিশীল ছিল বলেই এখানে প্রাণের বিকাশ হয়েছে। সবগুলো ঠিক না হলে প্রাণের বিকাশ হতো না—সে কথাটি অবশ্য কেউ খুব জোর দিয়ে বলে না। কারণ তখন হয়তো অন্যরকম প্রাণের বিকাশ হতো যে প্রাণের বিকাশের জন্য অন্যরকম পরিবেশের প্রয়োজন। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের সৌরজগৎ থেকে আমরা জানি, এখানে আরো গ্রহ আছে, গ্রহের সমান চাঁদ আছে, কিন্তু সেগুলোর কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই আপাতত ধারণা করে নেওয়া হচ্ছে পৃথিবীর মতো আকার-আকৃতি, জল-হাওয়া যেসব গ্রহে আছে সেখানে প্রাণীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা হয়তো বেশি। তাই বিজ্ঞানীরা আলদাভাবে ঠিক এই পৃথিবীর কাছাকাছি গ্রহকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ গ্রহগুলোকে বলা হয় আবাসযোগ্য গ্রহ, ইংরেজিতে হেবিটেবল প্ল্যানেটস (habitable planets)। একটি নক্ষত্রকে ঘিরে তার কক্ষপথের যে অংশটি বসবাসযোগ্য ভাবে থাকার সম্ভাবনা আছে তার অন্য একটি নামও আছে, সেটি হচ্ছে গোল্ডিলকস এলাকা (Goldilocks zone), এবং গোল্ডিলকস এলাকার বসবাসযোগ্য গ্রহকে বলে গোল্ডিলকস গ্রহ!

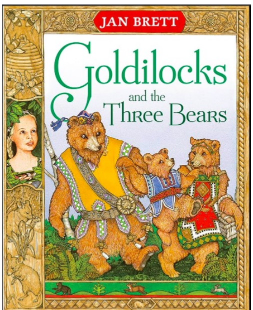

10.1 রূপকথার বই: গোল্ডিলকস।

গ্যালাক্সির বসবাসযোগ্য এলাকার নামকরণ গোল্ডিলকস করার পিছনে একটি মজার কারণ রয়েছে। তোমরা যারা পৃথিবীর নানা দেশের রূপকথা পড়েছো তারা হয়তো গোল্ডিলকস নামে ছোট একটি মেয়ের কাহিনিটি পড়ে থাকবে। সেখানে আছে গোল্ডিলকস নামে ছোট একটি মেয়ে বনে হারিয়ে গিয়েছিল। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে বনের ভেতরে তখন সে

হঠাৎ একটি ছোট বাসা দেখে সেখানে ঢুকেছে। সেই বাসায় সবকিছু তিনটি করে, সেই তিনটির মাঝে একটির সবকিছু একদিকে বেশি, অন্যটির অন্যদিকে বেশি এবং আরেকটির সবকিছু মাঝামাঝি এবং পরিমিত। যেমন, সেখানে তিন বাটি স্যুপ, একটি বড় বাটির স্যুপটি খুব গরম, আরেকটা বড় বাটির স্যুপ খুব ঠান্ডা, আরেকটা ছোট বাটির স্যুপ বেশি গরমও না, বেশি ঠাণ্ডাও না, ঠিক মাঝামাঝি তাপমাত্রার। গোল্ডিলকস সেই মাঝামাঝি তাপমাত্রার স্যুপটি খেয়েছে। ঠিক সেরকম অন্য সবকিছুর মাঝে দুটি হচ্ছে দুই দিকে বাড়াবাড়ি, আরেকটি মাঝামাঝি এবং গোল্ডিলকস সবসময় মাঝামাঝিটি বেছে নিয়েছে।

আবাসযোগ্য গ্রহের বেলাতেও সেটি হতে হবে। সেই গ্রহের নক্ষত্রটি খুব বেশি বড় হতে পারবে না, তাহলে খুব দ্রুত সেই নক্ষত্রটি নিঃশেষ হয়ে যাবে, সেই নক্ষত্রের গ্রহটিতে বুদ্ধিমান প্রাণের বিকাশের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে না। আবার খুব ছোটও হতে পারবে না, তাহলে গ্রহটিকে আবাসযোগ্য হতে হলে সেটিকে নক্ষত্রের খুব কাছে থাকতে হবে, তখন টাইডাল লকে আটকা পড়ে তার অক্ষে ঘূর্ণন বন্ধ হয়ে যাবে, গ্রহের একদিকে হবে শুধু দিন অন্য দিকে হবে শুধু রাত, আবহাওয়া হবে ভয়াবহ। আবার গ্রহটিও খুব বড় হতে পারবে না, তাহলে বায়ুমণ্ডল হবে বিশাল, তার চাপ হবে অবিশ্বাস্য। খুব ছোট হলে গ্রহের মহাকর্ষ হবে খুবই দুর্বল, বাতাস ধরে রাখতে পারবে না। গ্রহের কক্ষপথ নক্ষত্রের খুব কাছে থাকতে পারবে না, বেশি কাছে হলে গ্রহটি হবে খুব উত্তপ্ত আবার খুব দূরে হলে হবে অবিশ্বাস্য শীতল বরফ গ্রহ—কাজেই তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ গোল্ডিলকস যেমন বাড়াবাড়ি কোনটি বেছে নেয়নি, সবকিছুই মাঝামাঝি বেছে নিয়েছে আবাসযোগ্য গ্রহের বেলাতেও তাই কোনোকিছুই খুব বেশি কিংবা খুব কম হতে পারবে না সবকিছুই হতে হবে মাঝামাঝি, সেজন্য আবাসযোগ্য এলাকাকে বলে গোল্ডিলকস এলাকা এবং আবাসযোগ্য গ্রহকে বলে গোল্ডিলকস গ্রহ!

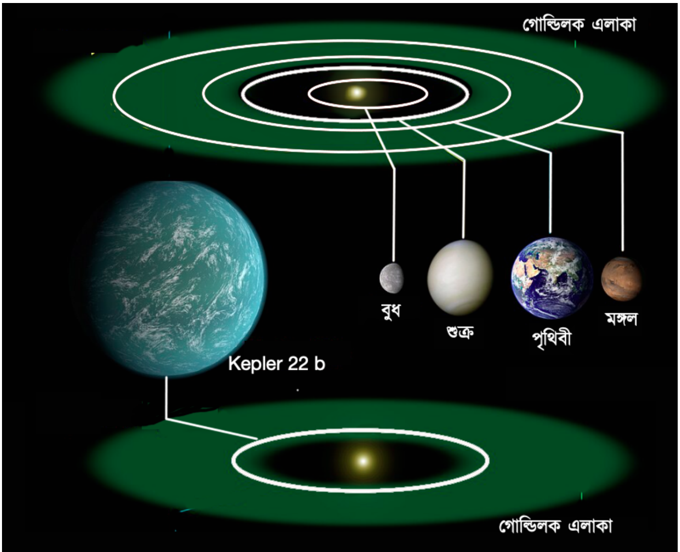

10.2 সৌরজগতের সাথে Kepler 22 নক্ষত্রের গোল্ডিলকস এলাকা তুলনা করার জন্য দেখানো হয়েছে (সবুজ রঙ), Kepler 22 b এক্সোপ্ল্যানেটটি গোল্ডিলকস এলাকায় পড়েছে।

গোল্ডিলকস এলাকাটি যেহেতু খুবই সুনির্দিষ্ট, বিজ্ঞানীরা তাই সূর্যের মতো নক্ষত্রগুলোকে খুঁজে বের করে তার কক্ষপথ ঘিরে যে অংশটুকু গোল্ডিলকস অঞ্চল সেখানে পৃথিবীর আকারের কোনো গ্রহ আছে কিনা খুঁজে বের করে দেখার চেষ্টা করছেন। তার বায়ুমণ্ডল বিশ্লেষণ করে পানির অস্তিত্ব আছে কিনা দেখার চেষ্টা করেছেন। পৃথিবীতে যে প্রাণের বিকাশ হয়েছে সেখানে একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে অক্সিজেন। অক্সিজেন অবিশ্বাস্য রকমের সক্রিয় গ্যাস, এটি দিয়ে আগুন জ্বলে, লোহাতে মরিচা ধরে, ধাতু ধাতব অক্সাইডে পরিণত হয়। পৃথিবীর গাছপালা যদি ক্রমাগত অক্সিজেন তৈরি না করে যেত, তাহলে বহু আগে পৃথিবীর সব অক্সিজেন ফুরিয়ে যেত (আর আমরা অবিবেচকের মত সেই গাছ কেটে উজার করে দিচ্ছি)। বিজ্ঞানীরা গোল্ডিলকস

এলাকার গোল্ডিলকস গ্রহে অক্সিজেন আছে কিনা খুঁজে দেখছেন। একটি গ্রহে যদি পৃথিবীর মতো প্রাণের বিকাশ হয় তাহলে তার বায়ুমণ্ডলে কিছু সুনির্দিষ্ট জৈব অনু পাওয়া যাবে। শত শত আলোকবর্ষ দূর থেকে বিজ্ঞানীরা সেগুলো খুঁজে যাচ্ছেন।

নিচে কয়েকটি গোল্ডিলকস গ্রহের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে:

Kepler 22 b: সূর্যের মত একটি নক্ষত্রকে ঘিরে প্রথম যে আবাসযোগ্য এলাকার গ্রহ খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তার নাম Kepler 22 b (ছবি 10.2) এটি পৃথিবী থেকে 640 আলোকবর্ষ দূরে। নাম শুনেই বুঝতে পারছ এটি কেপলার টেলিস্কোপ দিয়ে ট্রানজিট পদ্ধতিতে আবিষ্কার করা হয়েছিল, তাই আমরা তার আকার জানি (পৃথিবীর দ্বিগুণ ব্যাসার্ধ), ভর পুরোপুরি জানা নেই। গ্রহটির তাপমাত্রা পৃথিবীর কাছাকাছি এবং ধারণা করা হয় হয়তো গ্রহটি মহাসমুদ্র দিয়ে ঢাকা।

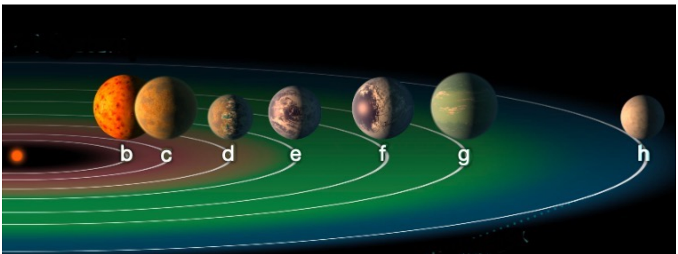

10.3 Trappist1 নক্ষত্রের 7 টি গ্রহের মাঝে e, f এবং g, এই তিনটি গোল্ডিলকস এলাকায়।

Trappist 1 e,f,g: তোমাদের ইতোমধ্যে Trappist 1 নক্ষত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, 40 বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের এই নক্ষত্রটির 7 টি গ্রহ রয়েছে, তার মাঝে e, f এবং g এই তিনটি গ্রহ গোল্ডিলকস এলাকার ভেতরে। Trappist1

একটি রেড ডোয়ার্ফ ধরণের নক্ষত্র (M), এটির ভর সূর্যের 9%, আকার আমাদের বৃহস্পতি গ্রহ থেকে একটু বড়, তাপমাত্রা মাত্র 2300 ডিগ্রি C। সম্ভবত গ্রহ তিনটির পৃষ্ঠদেশে পানি তরল অবস্থায় রয়েছে। এদের মাঝে e গ্রহটি ঠিক পৃথিবীর সমান আকার, ভর এবং ঘনত্ব। শুধু তাই নয়, পৃথিবী সূর্য থেকে যে পরিমাণ শক্তি পায় এটিও সেই একই পরিমাণ শক্তি পায়। f গ্রহটি

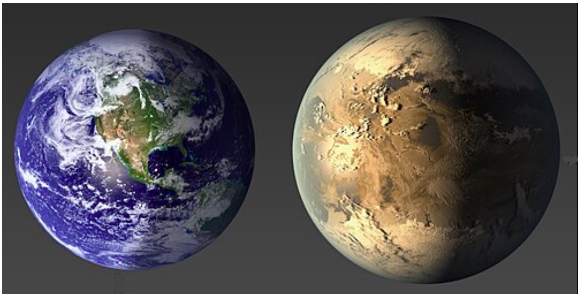

10.4 পৃথিবী এবং তার সাথে Kepler 186 f এক্সোপ্ল্যানেট।

পাথুরে এবং একটু দূরে, মঙ্গলগ্রহের সমান শক্তি পায়, তবে বায়ু মণ্ডল আছে বলে সম্ভবত তাপ ধরে রাখতে পারে। g গ্রহটি সাতটি গ্রহের মাঝে সবচেয়ে বড় গ্রহ। একটু দূরে বলে, একটু বেশি শীতল। আশা করা হচ্ছে গ্রিন হাউস এফেক্টে এটি তাপ ধরে রাখবে। তোমাদের আগেই বলা হয়েছে JWST দিয়ে এই গ্রহগুলোর বায়ুমণ্ডল বিশ্লেষণ করে দেখা হচ্ছে। e, f, g এই গ্রহ তিনটির গ্রহ-বছর যথাক্রমে ছয় দিন, নয় দিন এবং বারো দিন। কক্ষপথের দূরত্ব সূর্য থেকে বুধ গ্রহের দূরত্বেরও দশগুণ কাছে, তাই প্রায় নিশ্চিত যে গ্রহগুলো টাইডালি লক হয়ে আছে।

Kepler 186 f: এটি ছিল প্রথম আবিষ্কৃত পৃথিবীর সমান গ্রহ। এই গ্রহটিকে পৃথিবীর বোন (sister) না বলে পৃথিবীর মামাতো বোন (cousin) বলা হয়! নক্ষত্রটি 580 আলোকবর্ষ দূরের একটি M টাইপের রেড ডোয়ার্ফ। সূর্য থেকে

পৃথিবী যে পরিমাণ শক্তি পায়, এক্সোপ্ল্যানেটটি পায় তার এক তৃতীয়াংশ, মঙ্গল গ্রহের সমান। এটি পাথুরে গ্রহ, কক্ষপথ বুধ গ্রহের কক্ষপথের সমান, গ্রহ-বছর 130d.

Proxima Century b: Proxima Century নক্ষত্রটি আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র—মাত্র চার আলোকবর্ষ দূরে। এটিও M ধরণের এবং নক্ষত্রটির ভর সূর্যের ভরের 12%, তাপমাত্রা সূর্যের তাপমাত্রার অর্ধেক, প্রায় 3000 ডিগ্রি C। গ্রহটি নক্ষত্রের খুব কাছে (বুধ গ্রহের দূরত্বেরও 10 ভাগের এক ভাগ) কাজেই নিশ্চয়ই টাইডালি লকড । তবে গ্রহটিতে যদি বায়ুমণ্ডল থাকে তাহলে তার তাপ পুরো গ্রহে ভাগাভাগি করে করে মাঝামাঝি তাপমাত্রার হতে পারে! নক্ষত্রের খুব কাছে বলে গ্রহ-বছরও কম, মাত্র 11d। পৃথিবীর সমান ভর (1.17), সম্ভবত গ্রহে পানিও আছে। নক্ষত্রটি যথেষ্ট অস্থিতিশীল বলে সৌর ঝড় (solar flare) সম্ভবত গ্রহের উপর অনেক প্রভাব ফেলে!

10.5 Proxima Century b এর কাল্পনিক ছবি, গ্রহ থেকে দূরে আকাশে নক্ষত্রটিকে দেখা যাচ্ছে।

Kepler 452 b: আগের তিনটি উদাহরণই ছিল রেড ডোয়ার্ফ ধরণের নক্ষত্রের এক্সোপ্ল্যানেটের উদাহরণ! সূর্যের মত G টাইপের নক্ষত্রে এক্সোপ্ল্যানেট দেখা কঠিন বলে আমরা সেই নক্ষত্রগুলোর এক্সোপ্ল্যানেটের তথ্য এখনো সেভাবে পেতে শুরু করিনি। তবে একেবারে পাইনি তা বলা যাবে না,

তোমাদের Kepler 22 b এর কথা প্রথমেই বলা হয়েছে সেরকম আরেকটি এক্সোপ্ল্যানেট হচ্ছে Kepler 452 b, এর নক্ষত্রটি সূর্যের মতই, তবে ঔজ্জ্বল্য 20% বেশি, নক্ষত্রটির বয়স সুর্য থেকে 1.5 বিলিয়ন বেশি। এর এক্সোপ্ল্যানেট Kepler 452 b একটি সুপার আর্থ, পাথুরে, এবং পৃথিবী থেকে 1.6 গুণ বড়। তবে তাপমাত্রা 385 ডিগ্রী, যথেষ্ট বেশি, গ্রহটিতে শুক্রের মত বাড়াবাড়ি গ্রিন হাউজ এফেক্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে।

10.6 G ধরনের নক্ষত্র এবং তার এক্সোপ্ল্যানেট Kepler 442 b।

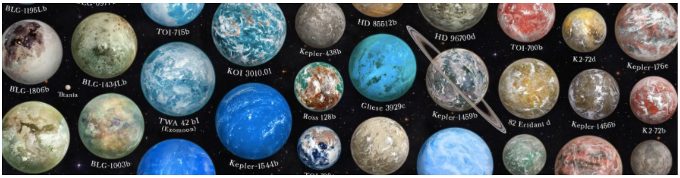

11. শেষ কথা

ড্রেক সমীকরণ নামে একটি সমীকরণ আছে। সেই সমীকরণটিতে বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্ক ড্রেক আমাদের গ্যালাক্সিতে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব নিয়ে একটি মজার সমীকরণ দিয়েছিলেন। সেই সমীকরণটির দিয়ে আমাদের গ্যালাক্সিতে কতগুলো বুদ্ধিমান প্রাণীর বিকাশ হয়েছে তার সম্ভাব্য সংখ্যা অনুমান করা যায়। সমীকরণটি এরকম:

$$N = R^* \times f_p \times n_e \times f_l \times f_i \times f_c \times L$$

এখানে

N = যত সংখ্যক বুদ্ধিমান প্রাণী যোগাযোগের জন্য রেডিও সিগনাল পাঠাচ্ছে।

R* = আমাদের গ্যালাক্সিতে কী হারে প্রতিবছর নতুন নক্ষত্র তৈরি হচ্ছে

f_p = নক্ষত্রের কত অংশে সৌরজগতের মতো গ্রহমণ্ডলী আছে

n_e = এই গ্রহগুলোর মাঝে কত অংশ প্রাণের বিকাশের মতো পরিবেশ রয়েছে

f_l = প্রাণ বিকাশের পরিবেশ আছে এরকম গ্রহের কত অংশে সত্যি সত্যি প্রাণের বিকাশ হয়েছে

f_i = যে প্রাণের বিকাশ হয়েছে, তার মাঝে কত অংশ বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে।

f_c = বুদ্ধিমান প্রাণীর কত অংশে রেডিও সিগনাল পাঠানোর মতো প্রযুক্তি গড়ে উঠেছে,

L = বুদ্ধিমান প্রাণী প্রযুক্তিতে উন্নত হওয়ার পর সেই সভ্যতা কত বছর টিকে থেকেছে

দেখতেই পাচ্ছো এই ভিন্ন ভিন্ন রাশিগুলোর ভিতরে অল্প কয়েকটি সঠিকভাবে জানা সম্ভব। কয়েকটি মোটামুটিভাবে অনুমান করা যায় এবং কয়েকটি অনুমান করাও দুঃসাধ্য। তবে খুবই আশাবাদী হয়ে অনুমান করলে দেখা যায় আমাদের গ্যালাক্সিতে প্রায় 4,000 বুদ্ধিমান এবং উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছে এবং খুবই হতাশাব্যঞ্জক হিসেবে দেখলে সংখ্যাটি হবে 1 থেকেও কম। আমরা কোনটি ধরে নেব? অবশ্যই আমরা হতাশাব্যঞ্জক হতে চাই না, কিন্তু ড্রেক সমীকরণের কোন রাশিটি হতাশাব্যঞ্জক ফলাফল দিচ্ছে?

নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো সেটি হচ্ছে শেষ রাশিটি, যেখানে অনুমান করতে হয় যে প্রযুক্তিতে উন্নত হওয়ার পর সভ্যতা কত বছর টিকে থাকবে! যারা পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস জানেন তারা এটিকে খুবই বিপজ্জনক একটি সংখ্যা হিসেবে দেখেন। পৃথিবীর অবিবেচক দুর্বিনীত রাষ্ট্রনায়কেরা অন্যদের পদানত করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য যে পরিমাণ নিউক্লিয়ার অস্ত্র মজুদ করে রেখেছে, সেটি দিয়ে মানুষ একবার নয় পুরো পৃথিবীকে দশবার থেকে বেশি সংখ্যকবার ধ্বংস করে ফেলতে পারবে! অনেকেই ভাবেন, কোনো একজন উন্মাদ রাষ্ট্রনায়ক একবার একটি ‘লাল’ বোতামে টিপ দিয়েই সমস্ত পৃথিবীকে ধ্বংস করে আমাদের সভ্যতা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। আমরা জানি দুই দুইবার মানুষের উপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলা হয়েছে (ছবি 11.1), আরো একাধিকবার নিউক্লিয়ার বোমা ব্যবহারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল।

আবার সেরকম একটি অবস্থায় পৌঁছে যাবে না এবং সত্যি সত্যি নিউক্লিয়ার বোমা ব্যবহার করবে না কে সেই নিশ্চয়তা দিতে পারবে?

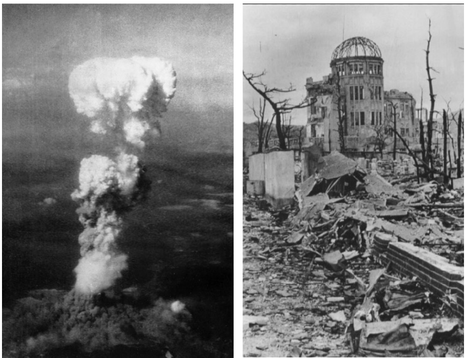

11.1 হিরোশিমায় প্রথম নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরণ এবং তার ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ।

শুধু যে নিউক্লিয়ার বোমা দিয়ে পৃথিবী ধ্বংস হতে পারে সেটিও সত্যি নয়, পৃথিবীকে বাসের অযোগ্য করে ফেলেও আমরা ধ্বংস হয়ে যেতে পারি। আমরা অবিবেচকের মত আমাদের প্রকৃতিকে ধ্বংস করে জলবায়ুর একটি ভয়াবহ পরিবর্তন নিয়ে এসেছি। অনেকেই মনে করেন আমরা যে অবস্থায় পৌঁছেছি সেখান থেকে হয়তো আর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারব না। সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার প্রক্রিয়া বুঝি এর মাঝেই শুরু হয়ে গেছে।

শুধু যে পৃথিবীকে বাসের অযোগ্য করে আমরা আমাদের সভ্যতা ধ্বংস করতে পারি তা নয়, মানুষ প্রজাতিকে বুদ্ধিহীন একটি প্রজাতিতে পরিণত করেও আমরা আমাদের সভ্যতা ধ্বংস করতে পারি। তোমরা কী লক্ষ করেছ পৃথিবীতে স্মার্টফোন হাতে একটি নূতন প্রজাতি গড়ে উঠেছে যারা নিজেরা আর স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে না? অর্থলোভী সফটওয়ার দানবেরা এমন এলগরিদম তৈরি করেছে যে একজন যেটি দেখতে চায় সে শুধু সেটাই দেখতে

পারে, এবং ভেবে বসে থাকে সবাই বুঝি এভাবেই চিন্তা করে! এখানেই শেষ হয়নি, এখন সেই ষড়যন্ত্রে যোগ দিচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) বা এআই (AI)! পৃথিবীর অনেক মননশীল চিন্তাবিদ মনে করেন অনিয়ন্ত্রিত এআই যখন নিজে নিজেকে বিকশিত করার পর্যায়ে চলে ASI (Artificial Super Intelligence) হয়ে যাবে তখন সুনিশ্চিতভাবে মানব সভ্যতা শেষ হয়ে যাবে।

স্টিফেন হকিং 2017 সালে বলেছেন: কার্যকর এআই তৈরিতে সাফল্য মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় ঘটনা হতে পারে, কিংবা উল্টোটা--সবচেয়ে বড় বিপর্যয়, আমরা এখনো জানি না কোনটি ঘটবে। এটি আমাদের সাহায্য করতে পারে আবার আমাদের কোন গুরুত্ব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে নিজের মত এগিয়ে যেতে পারে, এবং সম্ভবত এদের হাতেই আমরা ধ্বংস হব!

অবশ্যই আমরা আশাবাদী হতে চাই। অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করতে চাই শেষ পর্যন্ত মানুষের শুভবুদ্ধিরই জয় হবে, পৃথিবীতে মানুষের সভ্যতা টিকে থাকবে এবং আমরা এই সুন্দর পৃথিবীতে শুধু নিজেরা বেঁচে থাকব না, ভবিষ্যতে আমাদের মতোই ভিন জগতের উন্নত কোনো প্রাণীর সাথে যোগাযোগ করব।

কে জানে, হয়তো এই মুহূর্তে আমাদের মতোই কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী তাদের টেলিস্কোপ দিয়ে অবাক বিস্ময়ে আমাদের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে।

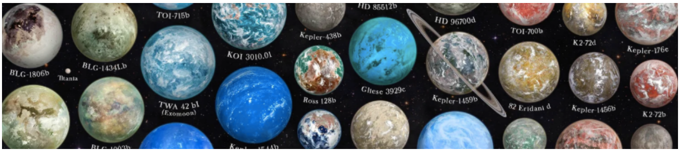

12. পরিশিষ্ট

12.1 বুধ গ্রহের কক্ষপথে ঘূর্ণন

12.1 ছবিতে বুধ গ্রহের নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণনটি দেখানো হয়েছে। বুধ-বছর হয় 89 দিনে, এবং নিজ অক্ষে একবার ঘুরে আসতে বুধের দরকার হয় 59 দিন। আমরা ছবিটি সহজ করার জন্য ধরে নিয়েছি বুধ-বছর হচ্ছে 90 দিনের এবং এবং নিজ অক্ষে বুধ-ঘূর্ণন হয় 60 দিনের। এতে মূল তথ্যের কোন উনিশ-বিশ হবে না কিন্তু ছবিটা আঁকা এবং বোঝা একটু সহজ

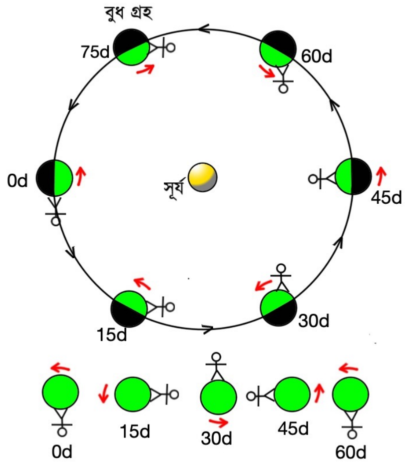

12.1 উপরে বুধ গ্রহের কক্ষপথ ঘিরে ঘূর্ণন এবং নিচে বুধ গ্রহের নিজ অক্ষ ঘিরে ঘূর্ণন।

হবে। ছবির উপরে প্রথমে দেখানো হয়েছে বুধ গ্রহ তার অক্ষে ঘুরছে। গ্রহটি যে আসলেই ঘুরছে সেটি বোঝানোর জন্য একটি মানুষকে গ্রহের উপর দাঁড়া করে দেওয়া হয়েছে, গ্রহের অক্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ ঘুর্ণন হলে মানুষটাও ঘুরে ঠিক তার আগের জায়গায় ফিরে আসবে। সেটাকে আমরা 15 দিন পর পর সমানভাবে ভাগ করে তখন মানুষটি গ্রহের কোথায় থাকবে সেটি ছবির নিচের অংশে দেখিয়েছি।

এবারে কক্ষপথ ঘিরে বুধ গ্রহের ঘুর্ণনের ছবিটার দিকে তাকাও। যেহেতু বুধ বছর হয় 90 দিনে আমরা সেটাকে 15 দিন করে 6 ভাগে ভাগ করতে পারি। যেহেতু ছবির উপরের অংশে আমরা ইতোমধ্যে 15 দিন পর পর গ্রহটি কী অবস্থায় থাকবে সেটা বের করে রেখেছি, সেখান থেকে নিয়ে কক্ষপথের বিভিন্ন জায়গায় বসিয়ে দিয়েছি। এবারে 45 দিন পর গ্রহের মানুষটি কোথায় আছে তাকাও, দেখবে সূর্য ঠিক তার মাথার উপর, যেটাকে ভর-দুপুর বলে। তার মানে আরো 45 দিন পর সন্ধ্যা হবে—অর্থাৎ সকাল থেকে সন্ধ্যা হতেই 90 দিন বা এক বুধ-বছর লেগে যাচ্ছে! রাত পার হতে আরো এক বুধ-বছর। অর্থাৎ এক সূর্যোদয় থেকে পরের সূর্যোদয় হতে দুই বুধ বছর লেগে যায়!

12.2 শুক্র গ্রহের কক্ষপথে ঘূর্ণন

নিচের ছবিতে শুক্র গ্রহের নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণনটি দেখানো হয়েছে। শুক্র-বছর হয় 225 দিনে, এবং নিজ অক্ষে একবার ঘুরে আসতে শুক্র গ্রহের দরকার হয় 243 দিন। আমরা ছবিটি সহজ করার জন্য ধরে নিয়েছি শুক্র-বছর হচ্ছে 240 দিনের এবং এবং নিজ অক্ষে ঘুরতেও সময় নেয় 240 দিন। একটু বেশি পরিবর্তন করে নিয়েছি, কিন্তু তাতে ছবিটি আঁকা এবং বোঝা অনেক বেশি সহজ হবে, কিন্তু মূল ধারণাটি বুঝতে কোন অসুবিধে হবে না।

আগের ছবির মতই উপরে প্রথমে দেখানো হয়েছে বুধ গ্রহ তার অক্ষে ঘুরছে। তোমাদের আগে বলা হয়েছে এবং দেখতেই পাচ্ছ গ্রহটি উল্টো দিকে ঘুরছে! এই ছবিটিতেও গ্রহটি যে আসলেই ঘুরছে সেটি বোঝানোর জন্য একটি মানুষকে গ্রহের উপর দাঁড়া করে দেওয়া হয়েছে, গ্রহের অক্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ ঘুর্ণন হলে মানুষটাও ঘুরে ঠিক তার আগের জায়গায় ফিরে আসবে। সেটিকে আমরা নিচের ছবিতে 60 দিন পর পর সমানভাবে ভাগ করে তখন মানুষটি গ্রহের কোথায় থাকবে সেটি দেখিয়েছি। এবারে উপরের কক্ষপথ ঘিরে শুক্র গ্রহের ঘুর্ণনের ছবিটার দিকে তাকাও।

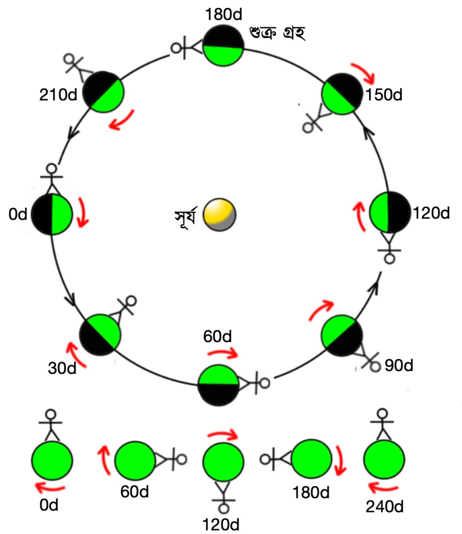

12.2 উপরে শুক্র গ্রহের কক্ষপথ ঘিরে ঘূর্ণন এবং নিচে শুক্র গ্রহের নিজ অক্ষ ঘিরে ঘূর্ণন। আঁকা এবং বোঝা সহজ করার জন্য দুটি ঘূর্ণনেই সমান সময় লেগেছে ধরে নেওয়া হয়েছে।

যেহেতু শুক্র-বছর হয় 240 দিনে আমরা সেটাকে 30 দিন করে 8 ভাগে ভাগ করতে পারি। নিচের অংশে আমরা ইতোমধ্যে 60 দিন পর পর কী অবস্থায় থাকবে সেটা বের করে রেখেছি, সেখান থেকে নিয়ে কক্ষপথের সঠিক জায়গায় গ্রহটি বসিয়েছি। ছবিটি বেশি জটিল না করার জন্য নিচে 30 দিন

পরে পরে শুক্র গ্রহে মানুষটি কোথায় থাকবে সেটি দেখানো হয়নি। কিন্তু আমরা আগে এবং পরে মানুষটির অবস্থান দেখে খুব সহজেই মানুষটি কীভাবে থাকবে বের করে ফেলেছি। এবারে 30 দিন পর গ্রহের মানুষটি কোথায় আছে তাকাও, দেখবে সূর্য ঠিক তার মাথার উপর, যেটাকে ভর-দুপুর বলে। তার মানে আরো 30 দিন পর সন্ধ্যা হবে—অর্থাৎ সকাল থেকে সন্ধ্যা হতেই 60 দিন লেগে যাবে, রাত পার হতে আরো 60 দিন। অর্থাৎ এক সূর্যোদয় থেকে পরের সূর্যোদয় হতে অর্ধেক শুক্র-বছর লেগে যায়!

12.3 ইউরেনাসের কক্ষপথে ঘূর্ণন

12.3 ছবিতে ইউরেনাসের কক্ষপথ ঘিরে ঘূর্ণন দেখানো হয়েছে। ইউরেনাস গ্রহটি যেহেতু নিজ অক্ষের সাথে প্রায় 90 ডিগ্রি কোণে ঘুরে তাই এটি দাঁড়িয়ে না থেকে 'শুয়ে শুয়ে' ঘুরে বলা যায়! ছবিটির উপরে এবং নিচে দুটিই কক্ষপথ ঘিরে ঘূর্ণনের ছবি, তবে ছবি দুটি কক্ষপথের দুটি ভিন্ন অবস্থান থেকে দেখানো হয়েছে, একটি অক্ষের দিকে লম্বভাবে দেখার অবস্থান অন্যতই অক্ষের দিকে দেখার অবস্থান। ইউরেনাস-বছর হচ্ছে 84 বছর দীর্ঘ, এই সময়টিকে 4 ভাগে ভাগ করে ইউরেনাসকে কক্ষপথের 4 জায়গায় দেখানো হয়েছে।

ইউরেনাসের উত্তর গোলার্ধ হচ্ছে ইউরেনাসের কক্ষপথের সাপেক্ষে উত্তর, এবং দক্ষিণ গোলার্ধ হচ্ছে ইউরেনাসের কক্ষপথের সাপেক্ষে দক্ষিণ। কক্ষপথ দুটির ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে নিচের কয়েকটি বিষয় দেখবে।

1. ইউরেনাসের উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল (ছবিতে 0 বছর) তখন সেখানে প্রায় 21 বছর সূর্য অস্ত যায় না, আকাশে সুর্য ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে

ঘুরতে থাকে! সেই 21 বছর দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল এবং সেখানে সূর্য উদয় হয় না!

2. ইউরেনাসের দক্ষিণ গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল (ছবিতে 42 বছর) তখন সেখানে প্রায় 21 বছর সূর্য অস্ত যায় না, আকাশে সূর্য ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতে থাকে! সেই 21 বছর উত্তর গোলার্ধে শীতকাল এবং সেখানে সূর্য উদয় হয় না!

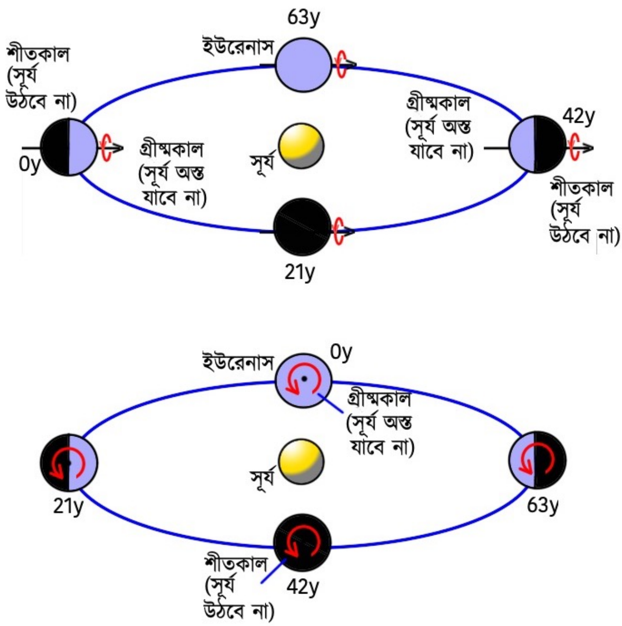

12.3 ইউরেনাসের কক্ষপথ। উপরের ছবিতে অক্ষের সাথে লম্ব ভাবে দেখার অবস্থান। নিচের ছবিতে অক্ষের দিকে সরাসরি দেখার অবস্থান।

3. ইউরেনাসের উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে (ছবিতে 21 বছর) শরৎকাল শুরু হয় তখন দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল শেষ হয়ে (ছবিতে 21 বছর) বসন্তকাল শুরু হয়। এই প্রায় 21 বছর সূর্য উদয় এবং অস্ত যায় তবে সূর্য উদয় হয় উত্তরদিকে (সূর্য বা কক্ষপথের সমতলের সাপেক্ষে) এবং অস্ত যায় দক্ষিণ দিকে!

4. ইউরেনাসের দক্ষিণ গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে (ছবিতে 63 বছর) শরৎকাল শুরু হয় তখন উত্তর গোলার্ধে শীতকাল শেষ হয়ে (ছবিতে 63 বছর) বসন্তকাল শুরু হয়। এই প্রায় 21 বছর সূর্য উদয় এবং অস্ত যায় তবে সূর্য উদয় হয় দক্ষিণদিকে (সূর্য বা কক্ষপথের সমতলের সাপেক্ষে) এবং অস্ত যায় উত্তর দিকে!

আগে থেকেই তোমাদের বলে দেওয়া হচ্ছে উপরের 4 টি বিষয় বুঝতে হলে তোমাকে কিন্তু পুরো ঘুর্ণনের ব্যাপারটি ত্রিমাত্রিক ভাবে ভাবতে হবে!

12.4 টাইডাল লক

তোমরা হয়তো শুনে থাকবে পৃথিবীতে সমুদ্রে জোয়ার ভাটা হয় চাঁদের মহাকর্ষ বলের আকর্ষণের কারণে—যদিও পৃথিবীতে চাঁদের মহাকর্ষ বলের আকর্ষণ থেকে সূর্যের মহাকর্ষ বলের আকর্ষণ বেশি! সূর্যের নয় চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর সমুদ্রে জোয়ার ভাটা হয় কারণ চাঁদ পৃথিবীর অনেক কাছে বলে তার আকর্ষণ পৃথিবীর সব জায়গায় সমান নয়, পৃথিবীর যে অংশ চাঁদের কাছাকাছি সেখানে বলের আকর্ষণ বেশি এবং বিপরীত অংশে বলের আকর্ষণ কম (ছবি 12.4)। পৃথিবীও চাঁদকে একইভাবে আকর্ষণ করে, চাঁদের যে অংশ পৃথিবীর কাছে সেই অংশকে পৃথিবী বেশি বলে আকর্ষণ করে এবং যে অংশ দূরে সেই অংশকে কম বলে আকর্ষণ করে। চাঁদ একসময় নিজ অক্ষে ঘুরপাক খেত, কিন্তু পৃথিবী ক্রমাগত কাছের অংশকে বেশি আকর্ষন করে তার নিজ

অক্ষে ঘূর্ণন থামিয়ে দিয়েছে। তাই এখন আমরা চাঁদের একটি পৃষ্ঠ দেখতে পাই, এটি সবসময় পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকে। এটি সব গ্রহ নক্ষত্রের জন্য সত্যি। যদি কোন গ্রহ নক্ষত্রের বেশি কাছে থাকে তাহলে সেই গ্রহের নিজ অক্ষে ঘূর্ণন ধীরে ধীরে থেমে যায়, আমরা তখন বলি তার টাইডাল লক (Tidal Lock) হয়েছে।

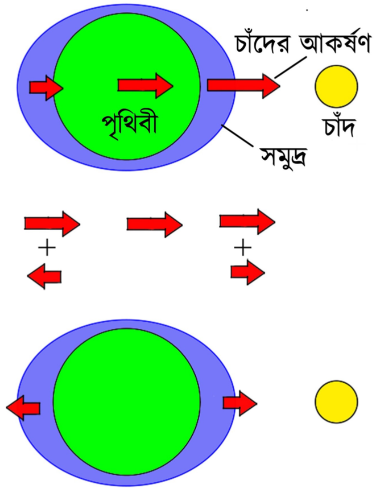

12.4 পৃথিবীতে চাঁদের অসমান আকর্ষণের কারণে জোয়ারের সময় চাঁদের বিপরীত দিকেও পানি ফুলে উঠে।

যেহেতু চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীর সবজায়গায় সমান নয়, তাই জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানি শুধু চাঁদের দিকে ফুলে যায় না, ঠিক তার বিপরীত দিকেও ফুলে যায়। ব্যাপারটি কেন হয় সেটি 12.4 ছবিতে দেখানো হয়েছে। ছবিতে উপরে পৃথিবী এবং সমুদ্রের পানির উপর চাঁদের আকর্ষণ দেখানো হয়েছে। মাঝখানে এই আকর্ষণ বলকে কীভাবে দুটি বলের যোগফল হিসেবে লেখা যায় সেটি দেখানো হয়েছে। যেহেতু সবজায়গায় সমান বল হলে সেটি জোয়ার ভাটা করতে পারে না তাই নিচে সমান বলটি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র অসমান বল দেখানো হয়েছে। এই বিপরীতমুখী বল পৃথিবীর বেলায় বিপরীত দিকেও পানিকে ফুলিয়ে তুলে। চাঁদের বেলাতে তার ঘূর্ণন থামিয়ে দেয়!

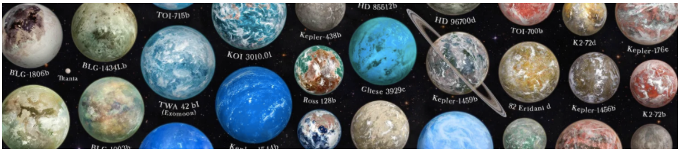

13. তথ্যসূচি

1. An introduction to Exoplanets, Kindle Edition by The Open University
2. Exoplanets: Planets Beyond the Solar System by Alex Bugeja
3. Space, DK, Smithsonian
4. https://science.nasa.gov/exoplanets/
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Exoplanet
6. If Anyone Builds It, Everyone Dies by Eliezer Yudkowsky and Nate Soares